শুকতারা

ঊনত্রিংশ বর্ষ
সপ্তম সংখ্যা
ভাদ্র • ১৩৮৩

সর্পরাজের দ্বীপে

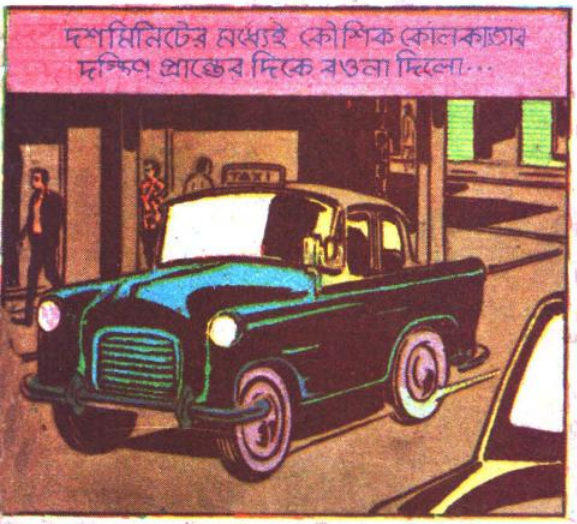

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সঙ্ঘামিত্রা সরকার
স্ক্যান করেছেন - সঙ্ঘামিত্রা সরকার
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্র পত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিয়ে চান বা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

রাম আর শ্যাম পেল আলাদীনের প্রদীপ

খেতে ভাল দেখতে ভাল ভাবতে ভাল

পার্লে পপিন্স

মিষ্টি ফলার পার্লে পপিন্স

৫ রকম ফলের স্বাদে ভরপুর
রাস্পবেরী, আনারস, লেবু
কমলালেবু ও মুসম্বী।

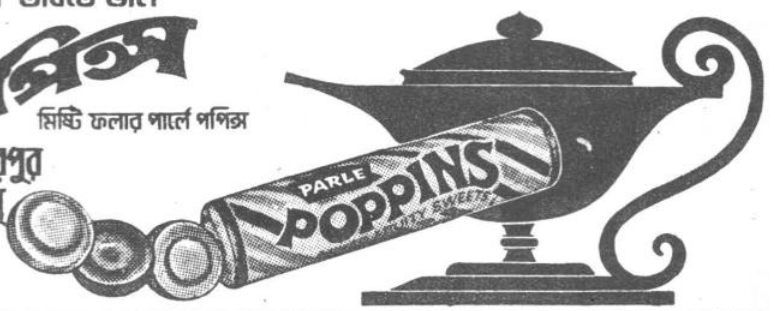

everest/220/PP·bn

বাঁটুল দি গ্রেট

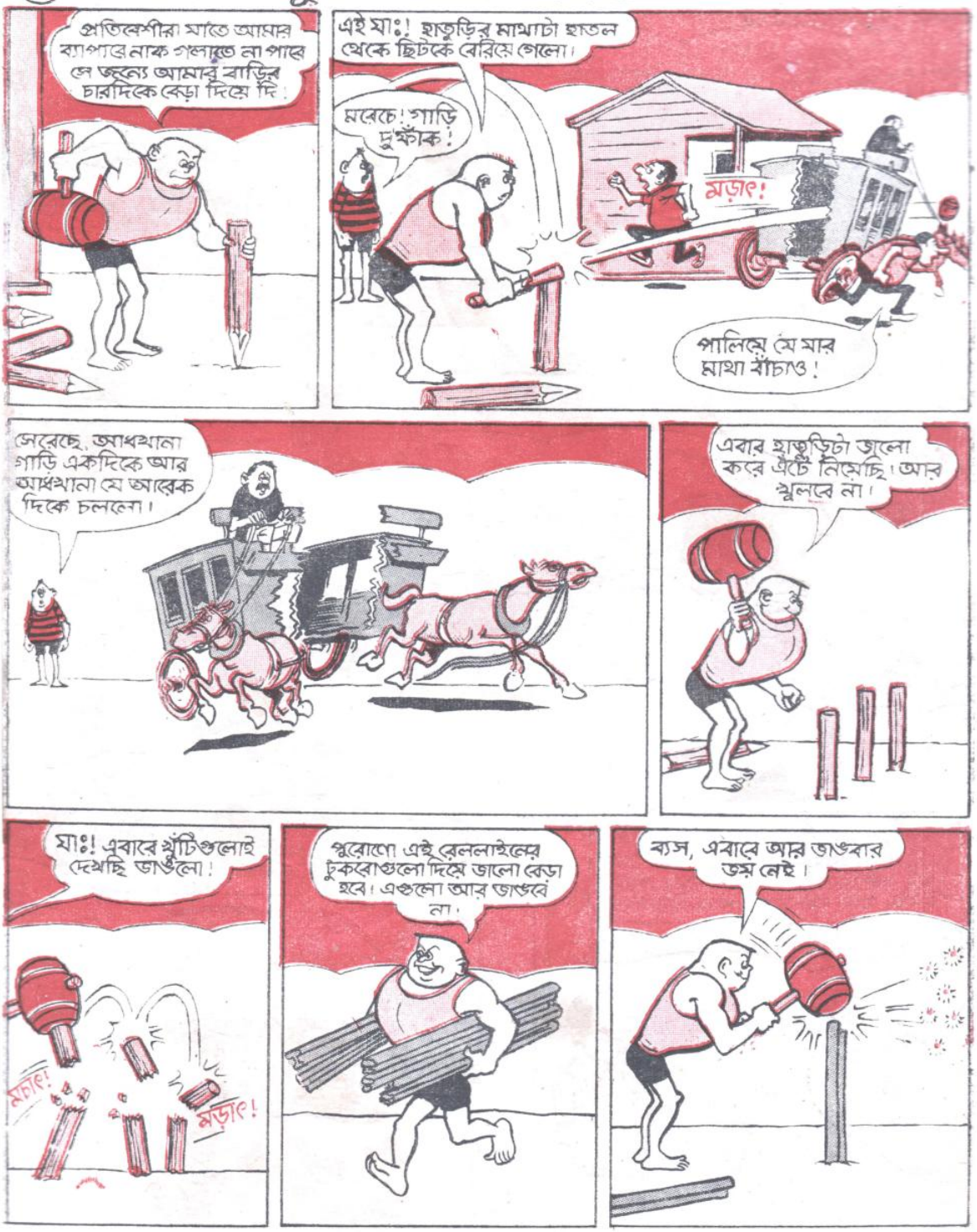
প্রতিবেশীরা যাতে আমার ব্যাপারে নাক গলাতে না পারে সে জন্যে আমার বাড়ির চারদিকে বেড়া দিয়ে দি।
এই যাঃ! হাতুড়ির মাথাটা হাতল থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলো।
মরেছে! গাড়ি দুখানা!
মড়াৎ!
পালিয়ে যে যার মাথা বাঁচাও!
সেরেছে, আধখানা গাড়ি একদিকে আর আধখানা যে আরেক দিকে চললো।
এবার হাতুড়িটা ভালো করে এঁটে নিয়েছি। আর খুলবে না।
যাঃ! এবারে খুঁটিগুলোই দেখছি ভাঙলো!
মচাৎ!
মড়াৎ!
পুরোনো এই রেললাইনের টুকরোগুলো দিয়ে ভালো বেড়া হবে। এগুলো আর ভাঙবে না।
ব্যস, এবারে আর ভাঙবার ভয় নেই।

যাক, গাড়িটাকে অনেক কষ্টে মেরামত করা গেছে।
থেমেচে! বাঁটুলদার হাতুড়ি থেকে আগুনের ফুলকি এসে গাড়িতে পড়ছে!

দ্যাখো বাঁটুলদা, গাড়িতে আগুন ধরে যাওয়াতে ঘোড়া দুটো ভড়কে গিয়ে ছুটতে সুরু করেছে!

ঘাবড়াবার কিছু নেই। এই জলটা সব ঠাণ্ডা করে দেবে।
হিসসস!

ওরে থাম থাম, ম্যাচিস কোথায়? আগুন নিভিয়ে ফেলেছি।

বাঁটুল, তোমাকে আর গাঁটের পয়সা খরচ করে বেড়া দিতে হবে না ওটা আমরাই দিয়ে নেবো। আর সেটাই হবে আমাদের পক্ষে নিরাপদ!

দেখো বাঁটুলদা, সারা পাড়াটাকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে পাড়া থেকে তোমাকে একেবারে একঘরে করে ফেলেছে।

"শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine Vide, No. 321 (9) T. B. C.

(Dated 14th August, 1971, 2B-20G/71)

সূচীপত্র—ভাদ্র, ১৩৮৩

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	সর্পরাজের দ্বীপে (সচিত্র চিত্র-কাহিনী)	—নারায়ণ দেবনাথ	প্রচ্ছদপট
২।	বাঁটুল দি গ্রেট	—নারায়ণ দেবনাথ	প্রথম ছবি
৩।	আবার দুজনে দেখা (কবিতা)	—শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৮৩
৪।	রবার্ট স্টিফেনসন (জানবার কথা)		৪৮৪
৫।	আজি হতে শত বর্ষ পরে (বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ)	—বৈজ্ঞানিক	৪৮৫
৬।	যুগে যুগে (ছবিতে গল্প)	—দিলীপ দাস	৫০৬
৭।	অপরাজেয় টারজান (অ্যাডভেঞ্চার)	—সব্যসাচী	৫০৮
৮।	প্রশ্ন ১০		৫১৪
৯।	পিকনিক (গল্প)	—শ্রীসুগত সেনগুপ্ত	৫১৫
১০।	৫১৪ পৃষ্ঠার ১০নং প্রশ্নের উত্তর		৫২২
১১।	বীর ছেলে বাংলার (ধারাবাহিক উপন্যাস)	—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা	৫২৩
১২।	মাছ ধরতে সাপ (কার্টুন)		৫২৯
১৩।	কালো বাঘের থাবা (ছবিতে গল্প)	—শ্রীতুষার চ্যাটার্জী	৫৩০
১৪।	বাঁশী বনাম বীণ (বিদেশী গল্প)	—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা	৫৩২
১৫।	উদাসীন মন (জীবন-কথা)	—পূরবী দেবী	৫৩৮
১৬।	অহোম রাজপুত্র কুলকর্ণী (অমর বীর কাহিনী)	—শ্রীমধুসূদন মজুমদার	৫৩৯
১৭।	সোনার নেউল (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	—দিলীপকুমার বসাক	৫৪৫
১৮।	"৺বনশ্রী মণ্ডল স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)		৫৪৭
১৯।	শশক থেকে শশধর (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	— অপূর্বকুমার সর	৫৪৮
২০।	হাঁদা-ভোঁদার চুনকাম (ছবিতে গল্প)		৫৫০
২১	জীবন দান (সত্য ঘটনা)		৫৫২
২২।	কার্টুন	—আশু	৫৫৩
২৩।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি)		৫৫৪

জেমসের মজার আসর

৫০০টি পুরস্কার জিতে নাও!

সেই সঙ্গে অতিরিক্ত বড় রকম পুরস্কারের সম্ভাবনা

এর মধ্যে কোন্‌টি বেখাপ্‌পা চিত্র বলতে পারো ?

শিগ্‌গীর! তোমাদের উত্তর আর সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস জেমসের একটি খালি প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম ৫০০ জন যারা সঠিক উত্তর পাঠাবে তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক গিফ্‌ট চেক পাবে। আর যদি তোমার বরাত ভাল, তোমার গিফ্‌ট চেকের উপর আরো ৪০০ টাকা পাবার সম্ভাবনা আছে—ভাগ্যবান বিজেতাদের অতিরিক্ত পুরস্কার।

বড় স্পষ্ট হরফে শুধু ইংরেজিতে তোমাদের উত্তর আর নাম ও ঠিকানা লিখবে। এই ঠিকানায় পাঠাও: Dept C—11 "Fun with Gems" Post Box No. 56, Thane 400 601.

উত্তর পৌঁছবার শেষ তারিখ:
১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬

রঙ বেরঙের, চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্ জেমস

CHAITRA-C-39 BEN

ঊনত্রিংশ বর্ষ ● ৭ম সংখ্যা ● ১৩৮৩, ভাদ্র

আবার দুজনে দেখা

শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

আরে, আরে, রাম রাম, চিনতে কী পারো ?
সে কী ? মনে পড়ছে না ? বেশ ভাবো আরো !
সেই এক ফাগুনের তার ছেঁড়া ট্রামে
আমি ছিনু ডান পাশে তুমি ছিলে বামে,
একসাথে দুজনায় ট্রাম থেকে নেমে
হাঁটতে হাঁটতে পথ গিয়েছিনু ঘেমে,
রুমালের কথা মনে হয়নি যে কারো !
তবু মনে পড়লো না ? ভাবো-ভাবো আরো !

● ●

যেখানের ঝালমুড়ি সব চেয়ে সেরা
ফুচ্‌কা ও দইবড়া কাঁচ দিয়ে ঘেরা।
দু-প্যাকেট মুড়ি মাখা আমি কিনলাম
তুমি সবটাই খেলে আমি দিনু দাম

আজো সেই বিশ-নয়া তুমি ভাই ধারো !
তবু মনে পড়লো না ? ভাবো-ভাবো আরো !

* * *

প্রাণের বন্ধু হয়ে তোমাতে আমাতে
কত কথা বললাম পথে যেতে সাথে।
তোমার পকেট ভারী মাস-পয়লাতে
দিলাম হালকা করে কাঁচির ছোঁয়াতে।
ভাবলাম তোমার-ও যা সে তো আমার-ও !
এবার পড়েছে মনে ? এ কী হাত ছাড়ো

রবার্ট স্টিফেনসন

রেলপথের উদ্ভাবক ও রেল ইঞ্জিনের সৃষ্টিকর্তা জর্জ স্টিফেনসনেরই পুত্র ইনি। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয় নিউক্যাসল-অন-টাইন-এর নিকটবর্তী উইলিংটন কী বন্দরে। পিতা জর্জকে শৈশবে কৈশোরে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। রবার্ট সেদিক দিয়ে পিতার চেয়ে ভাগ্যবান ছিলেন। উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল।

যন্ত্রপাতির কাজে পিতার কাছেই এঁর হাতে খড়ি। পিতার ইঞ্জিন গঠনের কাজে প্রভূত সাহায্যই ইনি করতেন। অনেক ইঞ্জিনের পরিকল্পনা রবার্টেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। কিন্তু পিতার কাজে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বতন্ত্র বিভাগে বিশেষজ্ঞরূপে ইনি প্রতিষ্ঠাও লাভ করেছিলেন। সেটি হল রেলসেতু নির্মাণ। অন্য সব ছোট সেতুর কথা ছেড়ে দিলেও কানাডার সেণ্ট লরেন্স নদের উপরকার সেতু তাঁর কৃতিত্বের অমর সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হলে গুণমুগ্ধ ইংরেজ জাতি ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে সমাধি দিয়ে এঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন।

আজ হতে শত বর্ষ পরে

বৈজ্ঞানিক

তখন রাত ন'টা। রাতের খাওয়া সেরে নিজের স্টাডিতে বসে ধূমপান করছিলেন বিখ্যাত সলিসিটর মিঃ অসীম বর্মন। পাশের টেবিলে আস্তে আস্তে রেডিওটাতে একটা গান হচ্ছিল। হঠাৎ গান বন্ধ হয়ে গেল। ঘোষক বললেন, "আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এইমাত্র খবর পাওয়া গেল বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক অরূপ চট্টোপাধ্যায় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। তিনি প্রাণিজগতে ফ্রীজিং টেকনিক (Freezing technique) ব্যবহার করার বিদ্যায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। দশ বছর আগে অধ্যাপক চ্যাটার্জী ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্তের সঙ্গে এই ফ্রীজিং টেকনিক নিয়ে মৌলিক গবেষণায় আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁর সহকর্মীর হঠাৎ অত্যন্ত রহস্যজনক অন্তর্ধানের পর তিনিও খানিকটা ভগ্নহৃদয়ে কাজকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন, যদিও তাঁর বিরাট পৈতৃক বাড়িতে কিছু গবেষণা তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাঁর আত্মার সদ্গতি কামনা করি।"

মিঃ অসীম বর্মন স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ বসে রইলেন, তারপর ফোন তুলে নিয়ে ডাকলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ সরকারকে, "হ্যালো, রমেন। আমি অসীম বলছি। এইমাত্র রেডিওতে জানলাম যে, অরূপ মারা গেছে। একটা বিশেষ অনুরোধ অরূপ আমাকে করে গিয়েছিল। সেটা এখনি পালন করতে হবে। তুমি আমার বাড়িতে চলে এসো।"

সরকার বললেন, "হ্যাঁ, অরূপ আমাকেও বলেছিল যে, তার মৃত্যুসংবাদ শুনেই যেন তোমায় ফোন করি, তার শেষ ইচ্ছা জানবার জন্য। আমি এখনি যাচ্ছি।"

বন্ধুর অপেক্ষায় বসে রইলেন মিঃ বর্মন। তাঁর চোখের সামনে ভাসতে লাগল অরূপের সঙ্গে

সাক্ষাৎকারের সেই দৃশ্যটা। সেদিন, প্রায় পাঁচ বছর আগে হঠাৎ অরূপ তাঁর বাড়িতে এসে বললেন, "অসীম, তোমার সঙ্গে খুব প্রাইভেট কথা আছে। তুমি তো আমার বিশেষ বন্ধু এবং আমার সলিসিটরও বটে। আমি তোমার কাছে একটা সীল্‌ড্‌ চিঠি রেখে যেতে চাই। তুমি আমার মৃত্যুসংবাদ যদি কোনদিন পাও তাহলে যত শীঘ্র পারো রমেনকে ডাকবে। ডেকে দুজনে মিলে এই চিঠি খুলবে। এতে আমার অত্যন্ত জরুরী গোটাকতক নির্দেশ আছে, সেইগুলো পালন করবে।"

অসীমবাবু তখন বলেছিলেন, "তোমার হঠাৎ মরার কথা মাথায় এল কেন?" তখন অরূপ বললেন "আজ চেক আপ করিয়ে জানতে পেরেছি যে, আমার হার্টের অবস্থা খুব ভাল নয়। আমার ডাক্তার বলেছেন সাবধানে থাকলে বছর পাঁচ-সাত বাঁচতে পারি, তবে তার মধ্যে খারাপ কিছুও হতে পারে। আমার ওপর একটা অত্যন্ত গুরু দায়িত্ব আছে। যদি হঠাৎ কিছু হয় আমি নিশ্চিন্ত থাকতে চাই যে, সে দায়িত্ব যথাযথ পালিত হবে। তুমি চিঠিটা খুললেই সব জানতে পারবে। এর বেশী কিছু আর জিজ্ঞাসা করো না।"

অ্যাটর্নী হিসাবে অনেকেরই শেষ ইচ্ছার অছি হিসাবে বর্মনবাবু থাকেন, তাই এটাও মেনে নিলেন। তবু বললেন, "যদি তোমার আগে আমি মারা যাই তাহলে?"

ডঃ সরকার জবাব দিলেন, "আমি রমেনকেও বলে গেলাম, তাহলে এই চিঠি তুমি রমেনকে দেবার ব্যবস্থা করে রাখবে। আর যদি দুজনেই আমার আগে মারা যাও, আমি নতুন করে অন্য ব্যবস্থা করব।"

খানিকটা রহস্যজনক বটে, তবু ডঃ বর্মন আর বন্ধুকে ঘাঁটালেন না। মনে হল, বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির ব্যাপারে কোনও গোপনীয় ব্যবস্থা করে যেতে চাইছেন তাঁর বন্ধু। তিনি বিপত্নীক ও নিঃসন্তান, তাই স্বভাবতই অ্যার্টনী হিসাবে তাঁর কাছেই শেষ ইচ্ছার ব্যাপারটা রেখে যাচ্ছেন এবং বোধহয় তাঁকে আর রমেনকে অছি করে যাচ্ছেন।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই ডঃ সরকারের গাড়ি এসে দাঁড়াল। অসীমবাবু বন্ধুকে নিয়ে এলেন বাড়িতে। স্টাডিতে বসে অসীমবাবু বললেন, "শোনো রমেন, মনে হয় মামুলী ব্যাপারই। অসীমের তো অনেক সম্পত্তি, তারই দেখাশোনা বা দান-ধ্যানের ব্যাপার বলে মনে হয়। যাই হোক, আমি সিন্দুক থেকে ওর সীল্‌ড্‌ চিঠিটা বার করছি। আচ্ছা, তার আগে তুমি আমাকে খুব অল্প কথায় বল তো, এই ফ্রীজিং টেকনিক, যা নিয়ে ও আর ওর বন্ধু বিপ্লব এত ফেমাস হল, সে ব্যাপারটা কি?"

রমেনবাবু বললেন, "শোন, টেকনিক্যালিটি বাদ দিয়ে বলা যায়, ঠাণ্ডা করে রাখলে প্রাণি-জগতের জিনিস অনেক দিন, এমন কি অনেক বছর অবিকৃত রাখা যায়, তা তো জান, কিন্তু সাধারণ-ভাবে সেগুলির অনেক সময় প্রাণহানী হয়। বিশেষ করে উচ্চস্তরের জীবদের ফ্রীজ করে পচনের হাত থেকে বাঁচানো যায়, কিন্তু তার প্রাণটা বাঁচানে যায় না। নিম্নস্তরের প্রাণীদের, যেমন ধরো প্লান্ট লাইফ কিন্তু বাঁচিয়েও রাখা যায়। অর্থাৎ ধর ছোলা বা গম যদি ঠাণ্ডা করে রাখা যায় বিশেষ পদ্ধতিতে, তাহলে দু'হাজার বছর পর আবার তা গরম করে তা থেকে গাছ করা যায়। রমেন আর বিপ্লব জীবজগতের উঁচু জাতের প্রাণীদের মানে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জীবন্ত অবস্থায় ঠাণ্ডা করে রেখে আবার পুনরুজ্জীবিত করার টেকনিক বার করেছে স্পেস ট্র্যাভেল রিসার্চের একটা অঙ্গ হিসাবে। ধর যদি বহু বছর ধরে কোন একটা

প্রাণীকে ঠাণ্ডা ঘরে রেখে তারপর আবার তাকে বার করে আনা যায় ও পুনরুজ্জীবিত করা যায় এবং এই টেকনিকটা যদি খুব আয়ত্বাধীন হয়, তাহলে দশ বছরের মহাকাশ ভ্রমণে পালা করে কিছু যাত্রীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যাবে। তাতে তাদের ওপর স্ট্রেন অনেক কম হবে। শুনেছি এই পদ্ধতিটা এরা দুজনে প্রায় পারফেক্ট করে এনেছিল, অবশ্য তার পরেই আকস্মিকভাবে অরূপের কোলিগ মারা যাওয়ায় ও তো সব কাজই ছেড়ে দিল।"

কথা শেষ হতে মিঃ বর্মন সিন্দুক খুলে একটা মোটা খাম বার করলেন, বেশ করে সীল করা। খুলে দেখলেন তাঁদের উদ্দেশ্য করে একটা বিরাট চিঠি রয়েছে ডাঃ চ্যাটার্জীর সই করা। চিঠিটা এই রকম—

প্রিয় অসীম ও রমেন,

ধৈর্য ধরে তোমরা পুরো চিঠিটা পড়বে। তাহলেই তোমাদের কর্তব্য কি জানতে পারবে। এবং যে জিনিসটা একটা নিছক পাগলামীর মত মনে হবে তোমাদের, তা হয়ত দেখবে, বিজ্ঞানের দিক থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

তোমরা জানো দশ বছর আগে বিপ্লব হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। আর আমি তখনই অ্যাকটিভ ডিউটি থেকে অবসর গ্রহণ করে আমার বাড়িতেই কাজকর্ম করতে থাকি। বিপ্লব উধাও হবার পর কিছুদিন বেশ হৈ চৈ হয়েছিল, আমার কাছেও বহু লোক খোঁজে এসেছিল। তাই এই চিঠিটা তোমরা ছাপাবার ব্যবস্থা করবে, যাতে তারা তাদের জবাব পায়।

বিপ্লব উধাও হবার প্রায় কয়েক মাস আগের কথা। একদিন কাজ শেষ করে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে বাড়ি যাবার পথে বিপ্লবের স্ট্রোক হয়। বয়স বেশী নয়, কিন্তু ওর প্রেসার খুব বেশী তাই, আর অত্যধিক স্ট্রেনের ফলে স্ট্রোকটা খুব মারাত্মক হয়। এ কথাটা সবাই জানে। কত মারাত্মক তা তোমরা জান না। আমি জানি। কারণ স্ট্রোকের দু'মাস পরে একদিন বিপ্লব আমাকে ওর বাড়িতে ডেকে পাঠায়। শান্তস্বরে বলে, "শোনো, এই স্ট্রোকের যে রিপোর্টটা আমায় দিয়েছে চিকিৎসকরা, তা সত্যিই আমার ডেথ সেনটেন্স। ওরা বলেছে যে, হার্ট পার্মানেণ্টলি ড্যামেজড। পূর্ণভাবে কার্যকর জীবন আমার আর সম্ভব নয় ও সেমি রিটায়ার্ড জীবন যদি কাটাতে পারি তাহলে কয়েক বছর বাঁচবো, তা না হলে যে কোন সময় আমি মরে যাবো।"—কথাগুলো ঠিক, আমি ওর ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেও তা জানতে পারি। তারপর বিপ্লব একটা সাংঘাতিক প্রস্তাব আমার কাছে রাখলো।

ও বলল, "জীবনটা তো শেষই হয়ে গেছে, মরার আগে বিজ্ঞানের কাজে আমি নিজেকে লাগাতে চাই, তুমি সহযোগিতা কর। আমাকে ফ্রীজ করে রেখে দাও। পঞ্চাশ থেকে একশ বছর যদি এভাবে রাখা হয় তাহলে একশ বছর পর দুনিয়াটার কি বদল হয়েছে আমি দেখতে পাব। আর তার সঙ্গে একটা অদ্ভুত এক্সপেরিমেণ্ট সফল হবে। এমনও হতে পারে ততদিনে ড্যামেজড হার্ট আবার মেরামত করার পদ্ধতিও আবিষ্কার হবে। আর আমি যমকে ফাঁকি দিয়ে প্রায় পুনর্জীবন লাভ করব, বিজ্ঞানের একটা অদ্ভুত বিজয় দেখান হবে।"

আমি তো শুনে হেসেই উড়িয়ে দিলাম। বললাম, "অসম্ভব, আমাকে খুনের দায়ে ফেলতে চাও নাকি? এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।"

বিপ্লব দমে গেল, কিন্তু কিছুই বলল না, শুধু গুম হয়ে বসে রইল। এর কিছুদিন পর দেখলুম ও আমার সঙ্গে জয়েণ্ট প্রজেক্টএ কাজ বন্ধ করে দিল।

নিজের পরীক্ষাগারে একা কাজ করতে লাগল। আমার সঙ্গে বিশেষ কথাও বলত না। অনেকের কাছে শুনলাম গভীর রাত পর্যন্ত ল্যাবে থাকে। কাজ করে, কারুকে থাকতে দেয় না। এমন কি ওর সহকারীদেরও তাড়িয়ে দেয়। কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। একদিন ওর কাছে গেলাম, বললাম, "এরকম পরিশ্রম করে নিজেকে মেরে ফেলছো কেন? অ্যাসিস্ট্যাণ্টদের দিয়ে কাজ করাও।"

ও বললে, "যতদিন বেঁচে আছি অ্যাকটিভলি থাকতে চাই। তবে মরার পর তুমি যেন আবার খাঁড়ার ঘা দিও না। তাহলেই যথেষ্ট হবে।"

কথাটা বেখাপ্পা শোনাল। তখন মানে বুঝতে পারিনি। যাক, এর পরের ঘটনা খুব সংক্ষেপে বলা যায়। দশ বছর আগে বিপ্লবের অন্তর্ধানের দিন আমাকে ওর বাড়িতে সন্ধ্যায় খেতে ডাকল। আমি যথাসময়ে গেলাম। আমার হাতে ওর চাকর একটা খাম দিল। বলল, "সকালবেলায় সায়েব এই চিঠিটা রেখে গাড়ি না নিয়ে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে গেছেন। এখনো ফেরেননি।"

সেদিন ছিল স্বাধীনতা দিবস। সমস্ত বন্ধ। ল্যাবরেটরি বন্ধ। অফিস বন্ধ। তবে কোথায় গেল। চাকর বলল, চিঠিটা দিয়ে চলে যাওয়ার সময় আর কিছুই বলেননি। বেরিয়ে এলাম চিঠি নিয়ে, গাড়িতে বসে পড়ব বলে। একটু অপমান লাগল। নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনে এ কিরকম ভদ্রতা! যা হোক, গাড়িতে বসে খাম খুলে দেখি একটা চিঠি আমার জন্য আর একটা রয়েছে পুলিস-কমিশনার-এর জন্য। পুলিস-কমিশনার-এর চিঠি খুব সংক্ষিপ্ত। স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করে ও আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য আত্মগোপন করছে। ওকে খোঁজার কোন দরকার নেই। যথাসময়ে ও আবার আবির্ভূত হবে। আমার চিঠিটা একটু বড়। তাতে লেখা—

প্রিয় অরূপ,

আমার অনুরোধ তো রাখলে না, তাই নিজের ব্যবস্থা নিজেই করেছি। এখন শুধু শেষরক্ষার ভার তোমার হাতে। দেখো যেন 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা' দিও না। আমি নিজেকে ফ্রীজিং চেম্বারে রেখে অটোম্যাটিক টাইমড সুইচ দিয়ে ফ্রীজ করে ফেলেছি আজ সকালেই। তুমি খবরটা যখন পাবে তখন আমার টেম্পারেচার ·৭৫ c.g. আমি সেই অবস্থায় থাকার জন্য অন্ততঃ সাত দিনের ব্যবস্থা পাকা করে নিয়েছি। তুমি ল্যাবরেটরি ডিরেক্টর। যে ফ্রীজিং চেম্বরএ আমি আছি সেটাতে সবাই জানে, একটা শিম্পাঞ্জীকে দু'বছরের জন্য ফ্রীজ করে রাখা হয়েছে। তুমি সেই চেম্বারটার ভার ডিরেক্টর হিসাবে নিজের হাতে নেবে। আর যতদিন পার ওর কণ্ট্রোল সমস্ত নিজের হাতে রাখবে। রিভাইভ করার চেষ্টা কোর না। কারণ তাতে আমার বাঁচার আর মরার চান্স একই। কারণ আমার হার্ট খুব খারাপ।

পুনর্জীবিত করার টেকনিক আমি নাও সহ্য করতে পারি। অন্ততঃ এখনকার টেকনিকে কিছুটা স্ট্রেন হয়। রিসার্চ চালিয়ে যেও, যদি পদ্ধতিটার আরও উন্নতি করা যায়। আমাকে জাগাবে আমার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ২০৭৬-এ। তার আগে ভগবানের দোহাই, আমাকে জাগিও না। আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। তাই বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় এটুকু ত্যাগ করা আমার পক্ষে কিছুই নয়। তোমার কনসেন্স-ও তো ক্লিয়ার, যা করবার তো আমি নিজেই করেছি।

এরপর বিশেষ কিছু বলার নেই। বিপ্লবের শেষ অনুরোধ আমি ঠেলতে পারিনি। তাই পরীক্ষাগারের চার্জ নিয়ে আমি ফ্রীজির ইউনিটটা

ব্যক্তিগত গবেষণার জন্য রেখেছি। অবসর নেবার আগে বাড়িতে অনেক খরচ করে পরীক্ষাগার তৈরি করি। আর বিপ্লবের ঠাণ্ডা শরীরকে স্থানান্তরিত করি ইউনিট সুদ্ধু। নিজের বাড়িতে নিয়ে আসি পার্সোনাল রিসার্চ আইটেম হিসাবে। তারপর থেকে যক্ষের মতন দশ বছর ওটাকে রক্ষা করে এসেছি সমস্ত সময়ে। বিদেশ যাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছি। রিভাইভাল টেকনিক-এর দশ বছরে অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু বিপ্লবের নিদ্রা সকালে ভাঙাতে চাইনি। ভেবেছি যা করা উচিত তা আমার পরে যাদের দায়িত্ব তারাই করুক। বিপ্লবের পুলিসকে লেখা চিঠিটা যথাসময়ে পৌঁছে দিয়েছিলাম। তোমরা আমার এই চিঠি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাবে। বলবে, আমার ইচ্ছা আমার সমস্ত সম্পত্তির আয় থেকে এই ল্যাবরেটরিকে মেনটেন করা হোক, আর বিপ্লবের শরীরকে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা হোক। এই আমার শেষ ইচ্ছা।"

লেখাটা পড়ে কিছুক্ষণ দুই বন্ধু স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করলেন মিঃ বর্মন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিশেষ বন্ধু। তাঁকে বললেন, "বিশেষ দরকারে এখনি আপনার কাছে যেতে চাই ডঃ সরকারকে নিয়ে।"

দুজনে চিঠি নিয়ে চলে গেলেন। এরপর যা হোল অল্পকথায় বলা যায়।

মুখ্যমন্ত্রী দেশের আইনজীবি, বৈজ্ঞানিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করলেন, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে। তাঁরা বললেন, "দশ বছর যখন হয়ে গেছে তখন সব দিক বিবেচনা করে দুই বৈজ্ঞানিকের সাধনাকে ব্যর্থ না করাই উচিত। সরকার ওঁদের অনুরোধ মত ব্যবস্থা নিন।"

মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে পাকা ব্যবস্থা করলেন যাতে সেই ফ্রীজিং চেম্বার বরাবরের জন্য চালু রেখে দেওয়া হয়। সমস্ত খরচের জন্য ট্রাস্টির টাকা তো আছেই। বেশী টাকা লাগলে সরকার নিজে দেবে।

বিপ্লবের কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানো হল না। বিপ্লবের ও অরূপের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা নিয়ে দিন কতক খুব উত্তেজনা হল। কিন্তু লোকে আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ভুলে গেল। সরকারী একটা বিভাগ মারফৎ বিপ্লবের দেহ সংরক্ষণ ব্যবস্থার কাজ চলতে লাগল। সরকারী প্রচেষ্টায় অরূপ চ্যাটার্জীর বাড়িতেই তার ল্যাবরেটরিতে সেই কাজ চলতে লাগল। অরূপ আর বিপ্লবের পদ্ধতিটাও বৈজ্ঞানিক জগতের একটা রুটিন-কাজের মত স্বাভাবিক হয়ে গেল। দু-এক বছর ঘুম পাড়িয়ে আবার জাগিয়ে তোলা প্রায়ই হতে লাগল, বিশেষ করে মহাকাশ যাত্রা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার কাজে। বৈজ্ঞানিকরা ছাড়া সবাই ব্যাপারটা ক্রমে ভুলে গেল।

(দুই)

একশো বছর পার হয়ে গেল। ষোলোই আগস্ট ২০৭৬-এর কয়েক সপ্তাহ আগের কথা। "অরূপ চ্যাটার্জী মেমোরিয়্যাল ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ অন লো টেম্পারেচার ফিজিওলজি"র ডিরেক্টর একটা ইস্তাহার প্রকাশ করলেন। ইস্তাহারটা এই রকম—

'আগামী কয়েক সপ্তাহের শেষে বিশ্বের একটা অত্যাশ্চর্য পরীক্ষার শেষ অধ্যায় শুরু হবে। এক্সপেরিমেণ্টটা শুরু হয় একশ' বছর আগে, এক বৈজ্ঞানিকের অপূর্ব আত্মোৎসর্গের মধ্যে। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার পর তিনি চেয়েছিলেন ফ্রীজিং টেকনিকের একটা এক্সপেরিমেণ্টে নিজেকে গিনিপিগ করে ব্যবহার করতে। তাঁর কাহিনী বিস্তারিতভাবে যাঁরা জানতে চান, আমাদের অফিসে এসে এ সম্বন্ধে তথ্য নিয়ে যেতে পারেন।

—"কে, অরূপ? সেই আমার ঘুম ভাঙালে?"

একশ বছর আগের এই মানুষটির আগামী ষোলোই আগস্ট ঘুম ভাঙানো হবে। বিজ্ঞান এ বিষয়ে এখন বহুদূর অগ্রসর হয়েছে, তাই আমাদের মনে হয় এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু বিপদ নেই। ডঃ দাশগুপ্ত ও তাঁর সহকর্মীর টেকনিক্‌কেই ভিত্তি করে অনেক বছরে এই কাজ আজ অনেক এগিয়ে গেছে। দু' এক বছর ঘুম পাড়িয়ে জাগানো এখন একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু সমস্যাটা হল অন্যরকম। একশ' বছরের পুরানো এই মানুষটি বর্তমান জগতে নিজের মানসিক ভারসাম্য রাখতে পারবেন কিনা। জেগে উঠে তাঁর মানসিক অবস্থা কিরকম হবে তা আমাদের অজানা। নিজের দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে, নিজের পরিচিত আত্মীয়-বন্ধু জগতের কোন চিহ্নমাত্র না পেয়ে এই মানুষটির নিঃসঙ্গতা তাঁকে কতদূর আঘাত দেবে, এ সবই আমাদের কাছে অজানা। আমরা তাই স্থির করেছি, নতুন দুনিয়ায় এই মানুষকে খুব ধীরে ধীরে জগতের সংস্পর্শে আনতে হবে। প্রথম কয়েক সপ্তাহ তিনি তাঁর বন্ধুর পরিচিত বাড়িতেই কাটাবেন। বেশির ভাগ সময় তাঁকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে রাখা হবে। দৈনিক কয়েক ঘণ্টা করে তাঁকে জাগিয়ে রাখা হবে ও তিনি ধীরে ধীরে জগতের সঙ্গে পরিচয় নেবেন। আমরা চাই না যে বাইরের জগৎ থেকে কোনও অবাঞ্ছিত শক তাঁর ওপর আসে। তাই তাঁর প্রাইভেসী এই সময়ে আমরা অতি সযত্নে রক্ষা করব। তাঁর সগোত্র দু' একজন বৈজ্ঞানিক, একজন ডাক্তার ও একজন মহিলা মনস্তত্ত্ববিদ (psychiatrist) তাঁকে সাহচর্য দেবে ও তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেবে। পরে ধীরে ধীরে তিনি বহির্জগতে আসবেন। তাঁর মনে যা কিছু চিন্তা উঠবে তা রেকর্ড করার ব্যবস্থা আমরা রাখব, যাতে তাঁর মনের অবস্থা আমরা সব সময় বুঝতে পারি। যথাসময়ে এই রেকর্ড থেকে তাঁর অনুমতি নিয়ে আমরা ডায়রী মতন করে তাঁর অভিজ্ঞতা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করব।

২০শে আগস্ট। ডাঃ বিপ্লব দাশগুপ্ত সম্পর্কে দ্বিতীয় ইস্তাহার প্রকাশ হল।

ডাঃ দাশগুপ্তকে যথাসময়ে রিভাইভ করা হয়েছে। রিভাইভ করার পর প্রথম দিকে তাঁর অবস্থা ছিল ক্লোরোফর্মের পর রোগীর যেরকম অবস্থা হয়। জ্ঞান লাভ করে তিনি ধরে নিয়েছিলেন তিনি তাঁর ল্যাবরেটরিতেই আছেন, আর তাঁর সকালে নিদ্রা ভাঙানো হয়েছে। জ্ঞান হতেই তিনি বললেন "কে, অরূপ? সেই আমার ঘুম ভাঙালে?"

তাঁর সামনে ছিলেন আমাদের এক বৈজ্ঞানিক ডঃ মিত্র। আবছা আলোয় তাঁকেই তিনি অরূপ

ভাবেন। তখন ডঃ মিত্র বললেন, "না, আমি অরূপ নই।"

"তবে তুমি কে? অরূপ কোথায়, এটা তো দেখছি তারই একতলার ঘরের মত লাগছে!"

ডঃ মিত্র বললেন, "এটা অরূপের বাড়ি বটে, তবে আপনাকে বেশ কয়েক বছর আমরা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম। সেই সময় যা কিছু হয়েছে তা আপনাকে আস্তে আস্তে জানাব।"

"আমি কতদিন ঘুমিয়ে ছিলাম, দশ-বারো বছর না তারও বেশী?"

"আরও বেশী দিন।"

ডঃ দাশগুপ্ত হঠাৎ চুপ করে গেলেন। খানিক-ক্ষণ পর আস্তে আস্তে বললেন, "এটা তো অরূপেরই বাড়ি। তার মানে অরূপ আর বেঁচে নেই। তাই না! তা না হয় নেই, কিন্তু আর সব পরিচিত লোকেরা কেউ নেই কেন? বড় জোর পনের বছর আমি ঘুমিয়েছি। তার মধ্যে সবাই নিশ্চয় মরেনি।"

"ডঃ দাশগুপ্ত, আপনাকে আস্তে আস্তে কে কোথায় আছে সবই জানানো হবে, আপাততঃ আপনি বিশ্রাম করুন। কিছু রবীন্দ্রসংগীত শুনুন। আপনার প্রিয় গানগুলো আমরা আনিয়ে রেখেছি। আর এই ওষুধটা খেয়ে ফেলুন।"

কয়েক দিনের প্রশ্নোত্তরে ডঃ দাশগুপ্ত ধীরে ধীরে জানলেন যে তাঁর পরিচিত কেউ তো নেইই, তাঁর পরিচিতদের নাতিরাও অনেক ক্ষেত্রে নেই। ধীরে ধীরে জানলেন তাঁর ঘুমের মধ্যে একশ' বছর কেটে গেছে, যেমন তিনি চেয়েছিলেন। ধীরে ধীরে সবটা শুনলেন।

তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া হল, "তাহলে আমারও আর বাঁচার দরকার নেই। এক্সপেরিমেণ্টটা তো সফল হয়েছে। আমি তাতেই খুশী। আমার দুনিয়া বলতে তো একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট মনুষ্যজাতি নয়। আমার নিজের পরিচিত মানুষই আমার দুনিয়া। তারা যদি কেউ না থাকেন, তবে আমি একা জেনে আর বুঝে কি করব? তোমরা আমাকে আবার শান্তিতে ঘুমোতে দাও, আমি আর বাঁচতে চাই না।"

"না ড দাশগুপ্ত, তা হয় না। বিজ্ঞানের প্রয়োজনেই আপনাকে আরো কিছুদিন একাকীত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। আমরা দেখতে চাই, একশ বছর নিদ্রার পর মানুষ কতটা নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে পারে। বিজ্ঞানের প্রয়োজনে ভাল না লাগলেও কিছুদিন আপনাকে বাঁচতে হবে।"

ডঃ দাশগুপ্ত আদর্শ বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাই আমাদের প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেছেন। অন্ততঃ সাময়িকভাবে সবকিছু দেখতে, শুনতে ও নিজের মনের প্রতিক্রিয়া ডায়েরীতে লিখতে রাজী হয়েছেন। এর পর থেকে বুলেটিন হবে তাঁর ডায়েরীটাই।

ডাঃ বিপ্লব গুপ্তের ডায়েরী—

সব শুনে বুঝে শুধু মনে হচ্ছে। মানুষ কি বোকা। আমি ঘুমোবার আগে ভাবতুম যমকে ফাঁকি দিয়ে একশ' বছর বাঁচলে কি অভিজ্ঞতাই না হবে। কিন্তু এ অভিজ্ঞতা একা নিয়ে আমি কি করব? আমার জগৎকে তো এ অভিজ্ঞতা পৌঁছে দিতে পারব না। আর এখনকার জগতের কাছে এ সব তো স্বাভাবিক ডাল-ভাতের মত। আমিই তাদের কাছে একটা আদিমকালের ইতিহাস। অভিজ্ঞতা একা একা পেলে দেখছি কিছু সুখ নেই। তবে বিজ্ঞানের প্রয়োজনে যদি কিছুদিন বাঁচতে হয় তাহলে আমার খারাপ লাগলেও তা করতে হবে। এত লোক আমার জন্যে এত করেছে, এখন বাকীটুকু আমাকে করতেই হবে। অনেক কিছু নিশ্চয়ই আমার অজানা, সেগুলি জানতে আমার খুব একটা কৌতূহল নেই। কারণ আমি একাই তা নতুন করে জানব। অতীতের দরজা যারা জানে না তাদের কাছে

পৌঁছে দেওয়া তো যাবে না। কালকে প্রথম এই বাড়ির বাইরে আমায় নিয়ে যাবে বলেছে। দেড়শ' কিলোমিটার ট্রিপ দিয়ে বাংলার গ্রামে যাব। একশ' পঁয়তাল্লিশ বছরের মানুষের এই প্রথম বিশ্ব-জগৎ দর্শন হবে।

সেপ্টেম্বর ২০৭৬

সকালে প্রাতরাশের টেবিলে এলেন আমার দুজন সঙ্গী মনস্তত্ত্ববিদ্ কুমারী ঘোষ আর পদার্থ-বিজ্ঞানী ডঃ আমেদ। কুমারী ঘোষ বললেন, "ডঃ দাশগুপ্ত, আজ থেকে আপনি যা দেখবেন, কিছু যদি আপনার নতুন লাগে, প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নোত্তরগুলির মাধ্যমে আপনি ধীরে ধীরে বর্তমান জগতের সঙ্গে পরিচিত হবেন। প্রাতরাশের পরই আমরা বেরিয়ে পড়ব। কোন্‌দিকে যাবেন বলুন।"

"আচ্ছা, আমার বাড়ি হচ্ছে তো বর্ধমান জেলার হলুদবাড়ি গ্রামে সেইখানেই চলুন।"

"বেশ, তাই হবে।"

গাড়িতে চড়ে বসলাম। সামনে আমি, পেছনে আমেদ আর গাড়ি চালাচ্ছেন কুমারী ঘোষ। ড্যাশবোর্ডের দিকে তাকিয়েই মনে হল, এ ত আমার পরিচিত মোটরগাড়ির মত নয়, এ তো ইলেকট্রিক মোটর চালাবার ব্যবস্থা।

"কুমারী ঘোষ আপনাদের এই গাড়িটি কিসে চলছে? পেট্রোলে নিশ্চয়ই নয়?"

কুমারী ঘোষ বললেন, "আমার নাম সুমিত্রা, আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন। না, এটা পেট্রোলে চলে না, ব্যাটারীতে চলে।"

ডঃ আমেদ বললেন, "পেট্রোল তো আপনাদের যুগেই ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছিল। এখন বিশেষ দরকার ছাড়া যানবাহন আর পেট্রোলে চলে না, এটা একটা ব্যাটারী চালিত গাড়ি। ব্যাটারী এখন অনেক উন্নত ধরনের হয়েছে, খুব হালকা আর সুবিধেজনক করে তৈরি হয়।"

"ব্যাটারী চার্জ করেন কি করে?"

"তা রাস্তাতেই দেখতে পাবেন। আপনাদের সময়কার পেট্রল পাম্পিং স্টেশনগুলো এখন ব্যাটারী চার্জিং স্টেশন হয়ে গেছে। তাছাড়া গাড়ির ছাদটা দেখুন।"

ছাদটায় দেখলুম একটা মৌচাকের মতন করে ফিউয়েল সেল (**Fuel cell**) করা।

"ও, আপনারা বুঝি সূর্যরশ্মিও কাজে লাগাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ, ব্যাটারী ছাড়া গাড়ির নিজের চালেতে বেশ খানিক সূর্যের কিরণ পড়ে, সেটাও আমরা ব্যবহার করি। তবে কেবল তাতে কুলোয় না, তাই সঙ্গে ব্যাটারীর ব্যবস্থা।"

"বাঃ, বেশ, তাহলে তো রাস্তায় ধোঁয়ার পাট প্রায় আপনারা চুকিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সময় এ নিয়ে কথা হোত। কিন্তু পেট্রোল শস্তা থাকায় এসবে গবেষণা বেশীদূর এগোয়নি।"

"আপনি দেখবেন, আমাদের বহু কাজেই আজ-কাল ব্যাটারী আর সূর্যকিরণের সাহায্যে সমস্ত স্মলস্কেল এনার্জীর প্রয়োজন মেটানো হয়। এ বিষয়ে আপনি ধীরে ধীরে আরো অনেক জানতে পারবেন।"

গাড়ি চলতে লাগল। রাস্তা-ঘাট বেশ চওড়া, কিন্তু সেই পুরানো শহরের ভিড় ও দৈন্য কিছুই নেই মনে হল। বুঝতেই পারছিলাম দেশের অবস্থা অনেক বদলে গেছে। শহরতলি ছেড়ে গাড়ি পড়ল গিয়ে গ্রামের দিকে। কিন্তু মাইলের পর মাইল যাচ্ছি, জঙ্গলের মত লাগছে, বড়জোর আম-কাঁঠালের বন। এই সময় মাঠভরা ধানের চাষ নেই কেন? কোথাও কোথাও শুধু দেখছি বিরাট কারখানার মতন শেড। আমার সঙ্গীদের বললাম।

"আচ্ছা, আমাদের সময় ধানের চাষে এই সময় মাঠ ভর্তি থাকত রাস্তার দু'পাশে। আপনারা

চাষবাস তুলে দিয়ে জঙ্গল করে ফেলেছেন, ব্যাপার কি? সারা রাস্তা তো দেখছি কিছু ফল-ফুলের বাগান, কিছু ডেয়ারী, আর তা না হলে জঙ্গল। দেশের খাদ্যসংস্থান হয় কি করে?"

"ডঃ দাশগুপ্ত, আপনার অন্তর্ধানের কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়ে সারা দুনিয়ার কৃষিব্যবস্থা একদম পালটে গেছে।" বললেন ডঃ আমেদ, "আপনি বলুন তো, কি হতে পারে যার জন্য খাদ্যদ্রব্যের চাষ বন্ধ হয়ে গেছে?"

"বুঝেছি, আপনারা গাছপালার জগৎ থেকে 'সালোকসংশ্লেষ' পদ্ধতি—মানে ফোটোসিনথেসিস্-এর মারফত স্টার্চ তৈরি শিখে নিয়েছেন। বাঃ!"

"হ্যাঁ, আপনার অনুমান সত্য। সূর্যের কিরণের সাহায্যে আবহাওয়ার কার্বনডাই-অক্সাইড নিয়ে তা সিনথেসিস্ করে শ্বেতসার তৈরি করে সমস্ত উদ্ভিদজগৎ, আপনাদের যুগের বৈজ্ঞানিকরাই সেই পদ্ধতি আয়ত্ত করেছেন। তার ফলে শত শত বর্গমাইল জুড়ে লক্ষ লক্ষ চাষীর হাড়ভাঙা খাটুনিতে যে শস্য উৎপাদন হত, আর তার প্রয়োজন হয় না। কোন দেশেই হয় না।"

"দাঁড়ান দাঁড়ান, ফোটোসিন্থেসিস ব্যাপারটা নিয়ে আমার বন্ধু বায়োকেমিস্ট অনিল সোম তো খুব কাজ করত, আর আমাকে মাঝে মাঝে এসে বলত। সব ভুলে গেছি। ব্যাপারটা খুলে বলুন তো একটু।"

"খুব সহজে এইভাবে বলা যায়—শ্বেতসার পদার্থে আছে কার্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। আর এই শ্বেতসারই তো আমাদের মূল খাদ্য। কারণ দেখুন, আমরা যে প্রোটিন খাই সেই প্রাণীরাও আবার গাছপালা খেয়েই তাদের পুষ্টি যোগায়। তাই আমাদের উদ্ভিদের সাহায্য ছাড়া আগে চলত না। বাতাসের কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস থেকে কার্বন, আর জল থেকে হাইড্রোজেন অক্সিজেন নিয়ে সূর্যকিরণের তেজকে কাজে লাগিয়ে স্টার্চ তৈরি করতে পারত একমাত্র উদ্ভিদরাই, পাতার মধ্যকার সবুজ পদার্থ ক্লোরোফিলের সাহায্যে। ক্লোরোফিলের সাহায্যে যে ঠিক কি করে এই বিক্রিয়াটা হয় সেটা বার করতেই আমাদের বৈজ্ঞানিকদের অনেক সময় লেগে গেল। একবার ল্যাবে কৃত্রিম স্টার্চ বানাতে পারলে আর চিন্তা কি? খাদ্যসমস্যা চিরদিনের মত মিটে গেল। সঠিক পদ্ধতিটা তো আপনাকে আমি বলতে পারব না, বুঝতেই পারছেন। ফিজিক্সের লোক, অত কেমিস্ট্রি জানি না।"

আমি বললাম, "আমাদের কাছে তো এটা একটা স্বপ্নের মত মনে হোত। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষে ফসল নষ্ট হয়ে কম লোক মারা গেছে নাকি! এখন আর সে রকম কখনো ঘটবে না। বিশ্বে তো আপনারা সত্যিই এবার বিপ্লব এনে দিয়েছেন।

আপনি তাহলে বলছেন যে, আমি সকালে ব্রেকফাস্টে যে কর্নফ্লেক্স আর রুটি খেলাম তা কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন স্টার্চ থেকে তৈরী?"

"হ্যাঁ, অবশ্য তার সঙ্গে কিছু ভিটামিন ও অন্যান্য জিনিস মেশানো হয়। আপনি যে দুধ খেলেন তাও কৃত্রিম।"

"তা তো বুঝলাম, তাহলে আপনাদের গ্রাম বলতে এখন ফলের বাগান আর ফুলের বাগান আর বড় জোর মাংসের জন্য কিছু পোলট্রি, ফিশারী ইত্যাদি। বাকী জায়গা তাই দেখছি শুধু জঙ্গল করে দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ, তার ফলে সারা পৃথিবী এখন আবার আগের মতন হয়ে গেছে, যেমন ছিল সভ্যতার গোড়ায়। ফলে পৃথিবীর আবহাওয়া বদলে গেছে। যাকে বলে জীবজগতের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের ভারসাম্যতাও আগের চেয়ে অনেক বেশী এসে গেছে।"

"বাঃ আপনাদের কাছে যা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার আমাদের কাছে তা সত্যিই ছিল নিছক স্বপ্নমাত্র। একবার আমার সহকর্মীদের আমার মতন একশ' বছর টপকে পৃথিবীতে যদি আনা যেত! দেশের লোক তাহলে আগের মতন আর অভাবে নেই।"

"তা তো নেই বটেই।"

"তারা করে কি? চাষই যদি বন্ধ তাহলে কোটি কোটি চাষী এখন কি করে? খাবার তৈরির কারখানায় আর কত জন লাগে।"

"আপনি আপনাদের গ্রামে গেলেই এ প্রশ্নের জবাব পাবেন। চাষীর সংখ্যা খুবই কমে গেছে, গ্রামের চেহারাও একদম বদলে গেছে।"

আমি বললাম, "আমি বরাবর বলে আসছি যে, সূর্যকিরণ আমরা সম্পূর্ণ অপচয় করছি। তার সদ্ব্যবহার করে আপনারা দেশের চেহারাই পালটে দিয়েছেন।"

বলতে বলতে গাড়িটা আস্তে আস্তে বসতি এলাকার দিকে আসতে লাগল। ডঃ সুমিত্রা ঘোষ দেখতে দেখতে বললেন, "ঐ যে বিরাট প্রায় এক বর্গমাইল জুড়ে ঘেরা জায়গা দেখছেন, ঐটা হল ফোটোসিনথেসিস করার একটা কারখানা। এ ছাড়া দেখুন, অনেক বাড়ির ছাদে সূর্যকিরণ ধরবার ব্যবস্থা ও সোলার এঞ্জিন রয়েছে। দু'পাশে দেখুন ফুলের, ফলের বাগান, মধ্যে মধ্যে পোলট্রি আর খামার। প্রত্যেক এলাকার সঙ্গে চাষীদের বাড়ি রয়েছে, যদিও আগের তুলনায় বাড়িগুলি অনেক ছড়ানো। গ্রামের কেন্দ্রে হচ্ছে হাট-বাজার, থিয়েটার, সিনেমা, খেলার মাঠ, বিদ্যালয় ইত্যাদি।"

বলতে বলতে এক জায়গায় গাড়ি থামল। আমি দেখলাম, আমার পুরানো বাসস্থান সংস্কার করে অতি যত্নে সংরক্ষণ করা রয়েছে। আর দরজায় লেখা রয়েছে "স্বাগতম! ডঃ দাশগুপ্ত।" নিজের পুরানো বাড়ি ঐভাবে দেখে আমার চোখে জল এসে গেল। নেমেই কারুকে কিছু না বলে ঘরটির মধ্যে ঢুকে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অশ্রুপাত করলুম। তারপর কিছুটা সামলে নিয়ে আবার সঙ্গীদের কাছে এলাম। বললুম, "মাপ করবেন, অনেক বয়েস তো হল, তাই দুর্বল হয়ে গেছি।"

তাঁরা উত্তরে বললেন, "আপনার এই অশ্রুপাত আমরা বুঝি, কারণ একশ' বছরে মানুষ তো মানুষই রয়ে গেছে। আপনার বাড়িটি যাতে আপনি দেখতে পান, তার জন্য একশ' বছর এটিকে আপনার গ্রামের লোক আর সরকার বাঁচিয়ে রেখেছেন। সেটা আজ সার্থক হল।"

গ্রামের লোকজন আমায় একটা বিশেষ অভ্যর্থনা জানাতে চাইল। আমি বললাম, "না! তা আমি চাই না। আমি চাই তোমাদের মধ্যে বেছে বেছে নানান বয়সের লোক অন্ততঃ জন দশ পনেরো, আমার সঙ্গে আজকের দিনটা থাক, খাও, আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলব।"

তাই স্থির হল। অনেক বিবেচনা করে ওরা জন পনের লোক ঠিক করল। তাদের বয়স দশ থেকে আশি পর্যন্ত—ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ী সবরকম। চায়ের আসরে বসে সত্তর বছরের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার নাম কি?"

"আমার নাম কল্যাণ ভট্টাচার্য। আপনার কথা আমি জানি। আপনার কথা আমি শুনি আমার বাবার কাছে। আমার বাবার নাম সুজিত ভট্টাচার্য।"

"ও, সুজিতের ছেলে তুমি? সুজিতের সঙ্গে আমার খুবই চেনা ছিল, আমার কথা ও তোমায় বলেছিল?"

"হ্যাঁ, সে এক মজার গল্প, তখন আমার দশ বছর বয়স। স্কুলে রচনা লিখতে দিল, দেশের একজন নামকরা বৈজ্ঞানিকের জীবনী লেখ। আমি বাড়ি

এসে বললাম, 'বাবা, কার কথা লিখব?' বাবা বললেন, 'কেন; আমাদের গ্রামের লোকই তো রয়েছে, বিপ্লব দাশগুপ্ত,' বলে আপনার কাহিনী সব বললেন। পায়ে পায়ে আপনার বাড়িটাও দেখিয়ে আনলেন। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। রচনা লিখে নিয়ে গেলাম। তারপর ক্লাসে কি মজা হল জানেন! আমরা সবাই ভীষণ ধমক খেলাম, টোকাটুকি করেছি বলে। পঁচিশটা ছেলে-মেয়ে সবাই লিখে নিয়ে গেছে বিপ্লব দাশগুপ্তের জীবনী। মাস্টারমশাই কিছুতেই বিশ্বাস করছেন না যে, আমরা পরস্পর পরামর্শ করিনি। তিনি তো এ গ্রামের লোক নন, তাই এখানে আপনার কি পরিচয় তা তিনি জানেনই না। আমরা গ্রামের নাম বদলাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অনেকে বললেন, "আপনি জীবিত, আপনার নামে এখন গ্রামের নাম করার মানে হয় না। তাতে অনেকে ভাববে আপনি আর জীবিত নেই।"

অনেকের সঙ্গে অনেক কথা হল, গ্রামটার জীবনযাত্রা ভীষণ বদলে গেছে। একেবারে অজ গ্রাম ছিল আমাদের সময়। এখন কেমব্রিজ বা ঐ ধরনের অবস্থাপন্ন গ্রাম্য টাউনশিপ বলে মনে হয়। ধান চাষ প্রায় উঠে গেছে, আছে খালি শৌখীন চাষ। হাড়ভাঙা খাটুনি নেই, লোকও অনেক কম।

ঘরে যে নানা বয়সের লোক ছিল, তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আমার সময়কার একশ বছর আগেকার এই গ্রামের মানুষদের মুখের ছবি খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু মিল খুবই কম। তখন গ্রামের মানুষদের মুখে একটা আলাদা ছাপ ছিল। এখন শহরের সঙ্গে গ্রামের তফাৎ খুবই কমে গেছে। এদের সকলেরই বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, মেয়েরাও ছেলেদের মত শার্ট-প্যান্ট পরা। জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা শাড়ি পর না?"

একটি মেয়ে বলল, "এমনিতে তো এরকম

"তোমরা শাড়ি পর না?"

পোশাকেই কাজকর্মের সুবিধা। সেজেগুজে বেড়াতে গেলে শাড়ি পরি, তাও কুঁচি দেওয়া সেলাই করা শাড়ি পাওয়া যায়, গলিয়ে পরে নিলেই হল। আপনাদের সময় তো শুনেছি লম্বা একফালি কাপড় কিনে নিজে নিজে ঘুরিয়ে পরতে হত

বৃদ্ধ কল্যাণ বলল, "হ্যাঁ, আমার মার ঐরকম কাপড় আমার কাছে কয়েকটা আছে, দেখাব তোদের।"

বেশ মজা লাগল। আমি চিরকাল বলে এসেছি, সেলাই করা ধুতি আর বোতাম-দেওয়া চাদর কেন পাওয়া যায় না। এখন দেখছি এরা সেই ব্যবস্থাই করেছে। তবে সেটা মেয়েদের, ছেলেরা ধুতি পরা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে। একটি বছর-বারো বয়সের ছেলেকে বললাম, "তোমার নাম কি? তুমি কার ছেলে?"

ও বলল, "আমার নাম টিংকু। আমার ঠাকুর্দাকে আপনার মনে আছে? তার নাম ছিল সুনীলকুমার মিত্র। আপনার সঙ্গে ছোটবেলায় নাকি দাদুর একবার খুব মারামারি হয়েছিল। দাদু আপনার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল।"

মনে পড়ল, সত্যিই ইস্কুলে আমার দুক্লাস ওপরে পড়ত একটা গুণ্ডামতন ছেলে, সব সময় আমাদের জ্বালাতন করত, আমি স্যারকে বলে দিয়েছিলাম বলে সে কি কাণ্ড।

"জানেন, দাদু বলতেন, মাথা ফাটার পর থেকেই নাকি আপনার বুদ্ধি খুলে গেল। তার আগে নাকি কেবল ক্লাসে অঙ্ক ভুল করতেন। আচ্ছা, আপনাদের সময় ঘোড়াতে গরুতে গাড়ি টানত, না? তারপর মোমবাতি জ্বেলে পড়তে হত, আমাদের মত এরকম বিজলী বাতি জ্বলত না।"

আমি হেসে বললাম, "তুমি যে আমাকে একেবারে প্রস্তর যুগে পাঠিয়ে দিচ্ছ দেখছি! তবে, গ্রামে তখন সত্যিই লণ্ঠন জ্বেলে পড়তে হত রাত্রে। শহরের আর গ্রামের মধ্যে একটা বিরাট তফাৎ ছিল। সেটা আর নেই দেখে সত্যি ভারি আনন্দ হচ্ছে।"

"লণ্ঠন মানে কেরোসিনের বাতি, না? আমাদের মিউজিয়মে একটা আছে দেখেছি।"

"আচ্ছা, এখন গ্রামে সেই আগের মত দুর্গা পূজো, কালী পূজো এসব হয় না? আগে নানা-রকম উৎসবে কত ঘটা হত।"

ছেলেমেয়েরা হাঁ করে রইল। কল্যাণ হেসে বলল, "সে সব এরা অনেকেই জানে না। আমাদের ছোটবেলা থেকেই ঢাক ঢোল বাজিয়ে বারোয়ারী পূজো করা প্রায় উঠে গেছে, আমরা মা-ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছি।"

"সে কি, আমাদের সময় তো মনে হত, এ সব বন্ধ করা অসম্ভব!"

"আসলে বেশী হৈ চৈ যারা করত, তাদের যে খুব একটা ধর্মবিশ্বাস ছিল তা তো নয়; তাই ঠিক হল যে আনন্দ উৎসব বছরে কয়েক দিন করা হবে, আর যাঁরা ধর্ম বা দর্শনতত্ত্বে আগ্রহী, তাঁদের জন্য নানারকম সভা-সমিতি, আলোচনাচক্র থাকবে। পূজো করতে চাইলে যে যার নিজের বাড়িতে করতে পারবেন। এখন আমরা নববর্ষ, স্বাধীনতা দিবস, দোলযাত্রা, রাখীপূর্ণিমা এ সব পালন করি। তা ছাড়া কালীপূজোর দিন বাজি পোড়ান, বিশ্বকর্মা পূজোর দিন ঘুড়ি ওড়ান এ সবের উৎসাহ একটুও কমেনি।"

যুক্তি দিয়ে বিচার করলে, সত্যিই খুব ভাল ব্যবস্থা। তবুও একশ বছর আগের কলকাতায় পূজোর সময়টা মনে পড়ে মন খারাপ লাগল। বললাম, "তাহলে তখন যে কত সুন্দর সুন্দর মাটির প্রতিমা, শোলার সাজ তৈরি হত, তাও উঠে গেছে?"

কল্যাণ বলল, "না, বিদেশে সে সবের চাহিদা আছে খুব। ঐ সব কারিগররা এখনো অনেক মূর্তি বানায়, অনেক বিদেশে পাঠান হয়, এখান-কার লোকও কেনে। তবে আমার মা বলতেন, পূজোর জন্যে যে মূর্তি তৈরি হত, তার নাকি মুখের ভাবই আলাদা ছিল। সেরকম মিষ্টি মুখ নাকি এখনকার কুমোররা আর করতে পারে না।"

"আপনাদের সময়কার উৎসবের গল্প বলুন না" —বলতে বলতে সবাই আমাকে ঘিরে ধরল। ভেবে দেখলাম, সত্যি আমার গল্প শুনতে এদের ভাল লাগারই কথা। আমি তো একটা জীবন্ত ইতিহাস বই। এদের গল্প আমি শুনে কি করব? কার জন্যেই বা লিখে রাখব? এখনকার মানুষকে এখনকার জীবনযাত্রার কথা শোনাবার কোন মানে হয় না। যত নতুন নতুন জিনিস দেখছি ততই পুরানো বন্ধুদের মনে পড়ছে। ভবিষ্যতে সমাজ

কিরকম হবে, ধর্মবিশ্বাস কিরকম হবে, এ সব নিয়ে আমরা কত জল্পনা-কল্পনা, তর্কাতর্কি করতাম, কিন্তু সত্যি করে কি হয়েছে, তা এখন আমার সেই সমাজতত্ত্ববিদ্ বন্ধু অরুণকে জানাতে পারব না, অর্থনীতিবিদ্ রমাপদকেও জানাতে পারব না। বললাম, "তোমরা এত সব করেছ, একটা টাইম মেসিন বানাতে পারনি? আমাকে তাহলে আবার আমার সময়ে পাঠিয়ে দিতে পারতে?"

"কেন, আমাদের সঙ্গে থাকতে বুঝি আপনার ভাল লাগছে না?" একটি ছোট মেয়ে বলল।

আমার মনে হল সত্যি, আমি ভারী স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি। বৈজ্ঞানিকোচিত ব্যবহার করছি না। এরা যাতে আমার কষ্ট না হয় তার জন্য কত চেষ্টা করছে, আমি তার মর্যাদা দিতে পারছি না। বললাম, "না না, তা মোটেই না, শুধু ভাবছি আমাদের দেশের এত উন্নতি, আমার বন্ধুরা কেউ জানতে পারল না। তাদের আর তাদের উত্তর-সূরীদের জন্যেই ত এতটা সম্ভব হয়েছে!"

তারপর অনেকক্ষণ ধরে ওদের আমাদের সময়কার গল্প বললাম—পূজোর সময় সেই ঢাকের শব্দ, দল বেঁধে পূজো দেখতে যাওয়া, রাত জেগে যাত্রা দেখা। এই সব সবাই শুনে ভারি খুশী।

"আচ্ছা, গ্রামের এতটা পরিবর্তন এত তাড়াতাড়ি কি করে হল, বল তো? আমাদের সময় তো মনে হত না যে, আরও একশ' বছর আগে গ্রাম অন্য রকম হয়ে যাবে।"

অল্পবয়সী যারা ছিল তারা বলল, "কি জানি, আমরা তো ছোটবেলা থেকেই এরকম দেখে আসছি।"

কল্যাণ বলল, "আসল বৈপ্লবিক পরিবর্তনটা হয়েছে আপনি ঘুমানোর কুড়ি-পঁচিশ বছর পর, আমার তখনও জন্ম হয়নি। আপনাদের সময় থেকেই তো খাদ্য-সমস্যা ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠেছিল। তারপর সারা পৃথিবীতেই বেশ একটা সংকট সৃষ্টি হল। সেই সময় নানা দেশের একদল বৈজ্ঞানিক মিলে স্টার্চ সিনথেসিসের প্রক্রিয়াটা আবিষ্কার করে ফেললেন। সেইটাই সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ। তার ফলে খাদ্যসমস্যা একরকম মিটেই গেল, অন্ততঃ না খেয়ে আর কারুকে থাকতে হল না। অবশ্য তখন কারখানায় যে গুঁড়ো ময়দার মতো পদার্থ তৈরি করে দিত, সেটা খেতে ভারী বিশ্রী ছিল। তবু যা হোক, দুর্ভিক্ষটা তো মিটে গেল। তারপর আস্তে আস্তে স্টার্চ তৈরির অনেক উন্নতি হল। এখন যে শস্য তৈরি হচ্ছে, তার স্বাদ আর চেহারা তো প্রায় স্বাভাবিক চাল-গমের মত।"

"হ্যাঁ, আমি তো খেয়ে কিছুই বুঝিনি।"

"গ্রামগুলো তো একেবারেই কৃষিনির্ভর ছিল। তাই ধানের চাষ উঠে যেতে গ্রামের সমাজ-ব্যবস্থাও বদলে গেল, ক্ষেতের বদলে বড় বড় কারখানা গড়ে উঠল, গ্রামের আশপাশেই। শহর থেকে বিস্তর লোক সে সব কারখানায় কাজ করতে এল। শহরের ভিড়ও তাই কমে গেল। অবশ্যই ব্যাপারটা ক'দিনে হয়নি। বেশ কিছু বছর ধরে আস্তে আস্তে ওলট-পালট হয়ে এমনি দাঁড়িয়েছে।"

জিজ্ঞেস করলাম, "এ গ্রামের আর কেউ বিজ্ঞানের ব্যাপারে নাম করেছে নাকি?"

একজন বলল, "হ্যাঁ, অর্জুন ভট্টাচার্য। সে তো গত দু' বছর হল চাঁদে রয়েছে।"

"তাই নাকি! কে সে? তার ঠাকুর্দার নাম কি?"

"তার ঠাকুর্দা অজিত ভট্টাচার্য।"

"ও, অজিতদা তো আমার খুবই পরিচিত ছিল। তাহলে অর্জুন আমার নাতিই হল।"

একটি মেয়ে সলজ্জভাবে বলল, "অর্জুন আমার বিশেষ বন্ধু, ও ফিরে এলে আমাদের বিয়ে হবার

কথা। আপনি বিদেশে গেলে টেলিভিশনে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন।"

"বেশ তো, আমি যদি পারি তার খবর তোমাকে পাঠাব। নাম কি তোমার?"

"আমার নাম লিপিকা।"

* * *

অক্টোবর ২০৬৭। দু'দিন হলুদবাড়ি গ্রামে কাটিয়ে আজ সকালে ফিরেছি। ট্রিপটা বেশ টনিকের কাজ করেছে। আমার সঙ্গে অন্ততঃ গ্রামের লোকদের একটা যোগসূত্র মনে অনুভব করছি। তাই আর দুঃসহভাব একা একা লাগছে না। যেন মনে হচ্ছে, আমি অতি বৃদ্ধ এক পিতামহ, বহুদিন বেঁচে আছি, অথচ আমার পরের জেনারেশন সব মারা গেছে। ডঃ আমেদকে বলেছি এবার কয়েকটা দিন শহরে ঘুরব, শহরটাকে ভাল করে দেখতে চাই। কাল থেকে আমাদের শহর দেখার প্রোগ্রাম।

সকালে খাওয়া দাওয়া করে শহর দেখতে বেরিয়েছি। পাশে বসে আছে সুমিত্রা। আজ গাড়ি চালাচ্ছেন ডঃ আমেদ। বার বার মনে হচ্ছে, যেন স্বপ্ন দেখছি। সুমিত্রা যেন আমারই মেয়ে। আবার চমকে উঠছি। সুমিত্রা তো আমার নাতির মেয়ে হতে পারে। আমার আসল বয়স তো একশ পঁয়তাল্লিশ। কলকাতার রাস্তা অক্টোবর মাসের আবহাওয়া, বেশ খরখরে রোদ। আমরা তো গাড়িতে বসে আছি। রাস্তায় বেশ লোক রয়েছে, সবার গায়ে হালকা ওভারকোট, মাথায় হুড (hood)। বৃষ্টি নেই, তবু এই অদ্ভুত বেশ কেন?

সুমিত্রাকে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, "ওগুলো ইনসুলেটেড কুলিং ওভারকোট। চাঁদে মানুষ বাস করতে গেল যখন, প্রথমেই তাদের দরকার হচ্ছিল শুধু দারুণ শীতের পোশাক নয়, দারুণ গরমের জন্যেও হালকা পোশাক। তাই থেকে বেশ কিছুদিন, অন্ততঃ বছর পঞ্চাশ আগে এই কোট তৈরি করা হয়েছে। এতে শরীর সব সময়ে, যত গরমই হোক, কুড়ি থেকে বাইশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপ থাকে। আবার শীতকালে ঠাণ্ডা দেশেও এটার সাহায্যে ঐ টেম্পারেচার মেনটেন করা হয়। অথচ পোশাকটা খুবই হালকা। আমাদের গাড়িতেই ঐরকম এক সেট পোশাক নিয়েছি। রোদে নেমে পরে দেখবেন চলুন।

রাস্তায় নামলাম, খুব চড়া রোদ, অক্টোবরে যেমন হয়। দাঁড়ানো যায় না। গায়ে কোটটা পরলাম। খুবই হালকা পোশাক। পরে একটা ছোট ফিতে টেনে বেঁধে দিতে বলল। দেওয়ামাত্রই শরীর জুড়িয়ে গেল।

"বাঃ, আপনারা তো সত্যিই এবার গরম দেশের উপযোগী একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিস বার করেছেন দেখছি! চমৎকার! আমাদের সময় এত হালকা পোশাক এভাবে কাজ করবে ভাবাই যেত না।"

"হ্যাঁ, ব্যাটারী আর রেফ্রিজারেশনের সরঞ্জাম ক্রমেই মিনিয়েচারাইজড্ হচ্ছে, তাই এটা সম্ভব হয়েছে। এখন রেফ্রিজারেশনের জন্য আর ভারি যন্ত্রপাতি লাগে না। আর সবচেয়ে মজা কি জানেন, গরমে বা রোদে সূর্যের তাপটাই কাজে লাগান হয় শরীর ঠাণ্ডা করতে। আপনার কোটের হাতাটা দেখুন। অজস্র হালকা টিউব গেছে। এইগুলি দিয়ে অনর্গল ঠাণ্ডা হাওয়া পাঠান হয়, আর গরম হাওয়া টেনে নেওয়া হয়। এনার্জি পাওয়া যায় সূর্যের তাপ থেকেই। ঐ একই পদ্ধতিতে এখন বাড়িতে আর গাড়িতেও কুলিং-সিস্টেম রাখা হয়েছে।"

আবার গাড়িতে বসা গেল।

শহরটা আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছে।

লোক আগের চেয়ে অনেক কম লাগে। গাছপালা বেশী। খানিক যেতে যেতে শহরের একটু বাইরের দিকে দেখলাম একটা পাওয়ার হাউস। কিন্তু দেখে বোঝাই যায় যে, ওটা কয়লাতে বা তেলে চলে না। ওদের জিজ্ঞাসা করতেই বলল, "আপনার ঘুমানোর পঞ্চাশ বছর পরে 'হাইড্রোজেন ফিউশান রিঅ্যাকশন' ব্যবহার করে পাওয়ার জেনারেশন সম্ভব হয়। এটা তারই একটা মডেল। আমরা এখান থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গ ও আশপাশের খানিকটা অঞ্চলের প্রয়োজনীয় সব পাওয়ার যোগান দিই। যদি দেখতে চান একদিন নিয়ে যাওয়া যাবে।"

"কলকাতার জনসংখ্যা এখন কত?"

"পনেরো লক্ষের কিছু বেশী। কলকাতার মতন আরো গোটাকয়েক বড় শহর গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গে। তার ফলে কলকাতার ওপর চাপ অনেক কমে গেছে। তা ছাড়া শহরে থাকতে লোকে আর খুব আগ্রহ দেখায় না। বাইরে থাকাই পছন্দ করে।"

"আচ্ছা, কলকাতার দু'একটা আমার চেনা জিনিস কিরকম অবস্থায় আছে আমি দেখতে চাই।"

"কি দেখবেন বলুন?"

কিছুটা ভেবে বললাম, "আমাদের সময় কলকাতায় এলেই লোকে দেখত কালীঘাটের মন্দির, বেলুড় মঠ, মনুমেণ্ট, মিউজিয়াম, হাওড়া ব্রীজ ইত্যাদি। সেগুলোর অবস্থা কি, দেখলে হয় অন্ততঃ বাইরে থেকে।"

"বেশ তো, চলুন না।"

প্রথমেই নিয়ে গেল কালীঘাট। মন্দির রয়েছে, আশেপাশে বাগান ও অনেক খোলা জায়গা। ওরাই বলল, "মন্দির আছে তবে আগের মতন অত দর্শনার্থীর ভিড় নেই। অনেক কমে গেছে।"

মনুমেণ্টটা রয়েছে, মোটামুটি সেইরকমই, কিন্তু জাদুঘরের পুরানো বাড়িটা আর নেই, অনেক বড় বাড়ি হয়েছে। হাওড়া ব্রীজ দেখতে গিয়ে দেখি গঙ্গার ওপর অন্ততঃ সাতটা ব্রীজ হয়ে গেছে। প্রায় সব বড় রাস্তাগুলোর যোগাযোগ আছে। বেলুড় মঠের কোনও পরিবর্তন হয়নি। বাগানটিও বেশ সাজানো আছে। ওরা বলল, "ঐতিহাসিক বাড়িগুলো মোটামুটি দেখলে চিনতে পারবেন, কারণ ওগুলো সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে।"

খানিকটা ঘুরতে ঘুরতে এবার ক্লান্ত লাগল, বললাম, "ফিরে চলুন, মোটামুটি শহরটা বেশ খানিকটা বদলে গেছে বুঝতেই পারছি, আর দেখে লাভ নেই।"

অরূপের বাড়িতে ফিরে আসা হল। তারপর ওরা বলল, "এবার বলুন, আপনার আর কি দেখবার জানবার ইচ্ছে।"

আমি বললাম, "একবার দেশের বাইরে যাওয়া যায় না? ইংলণ্ড বা আমেরিকায়, ওখানেও তো আমি অনেকদিন কাটিয়েছি।"

ওরা বলল, "আমাদের অফিসে আসুন, একটা মজার ব্যাপার আপনাকে দেখাব।"

অফিসে নিয়ে গিয়ে প্রথমেই দেখাল একরাশ টেলিগ্রাম এসেছে নানান দেশ থেকে। বিশ্বের সমস্ত জানা অজানা জায়গায় তারা আমায় দেখতে চায়, আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, আমি নাকি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। আমার জাগার ব্যাপারটা চাঁদে যাওয়ার মত টেলিভাইস্ড্ হয়েছে ও দুনিয়ার সবাই তা দেখেছে। সব দেখেশুনে আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে না। আমি যে বিশ্বে একান্তই একা, এটা আরো বেশী করে বুঝতে পারছি। আমি হচ্ছি একটা ভূত, আর সবাই জ্যান্ত ভূত দেখতে চায়। সাধারণ মানুষ দেখতে চায় বলে মনে হয় না। আমি বললাম যে, "তাহলে বিদেশে আমি যাব না। কি স্বদেশে, কি বিদেশে এমনিতেই আমি একা।

তাতে সবাই এরকম করলে আমি আরো বেশী একাকীত্ব অনুভব করব। আমি সাধারণ মানুষ, সেই রকমই আমি থাকতে চাই

সুমিত্রা বলল, "আমরাও ভেবেছি, খুব হৈ হল্লা আপনাকে নিয়ে করা যাবে না। বেশ শুনুন, আপনাকে আমরা বেনামে নিয়ে যাব। কেউ জানবে না আপনি কে, আপনার পরিচয় বদলে দেব। শুধু যদি বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আপনার কথা বলতে ইচ্ছে করে, তাহলে তাকেই আপনার পরিচয় দেব, দরকার হলে। আপনি কবে যেতে চান? আর কোথায় যেতে চান?"

আমি বললাম, "একবার কেম্ব্রিজের লো টেম্পারেচার ল্যাবরেটরিতে যেতে চাই, আর একবার নিউইয়র্কে যেতে চাই, আর কোথাও আপাততঃ নয়। আচ্ছা, বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে নিয়মকানুন কী আছে?"

"বিশেষ কিছুই নেই। গত পঞ্চাশ বছর হল কোনো দেশে যাবার বিশেষ বাধা নেই। কারণ সব দেশে লোক কম। জনসংখ্যা সর্বত্র কমে গেছে। তাই লোকে যদি আসে যায় তাতে কেউ আপত্তি করে না। কাজের তো অভাব নেই। পাসপোর্ট, ভিসা উঠে গেছে।"

"আমরা যাব কিসে, প্লেনে নিশ্চয়ই না।"

"যাওয়ার সময় দেখবেন আর একটা সারপ্রাইজ। সেটা কিন্তু এখন বলব না। তাহলে সারপ্রাইজ থাকবে না।" সুমিত্রা বলল।

বেশ মজার ব্যাপার মনে হল। কি আবার সারপ্রাইজ? রকেট-ট্রাভেল নাকি?

"সামনের সপ্তাহেই আপনাকে কেম্ব্রিজে নিয়ে যাওয়া হবে। ইতিমধ্যে এখানেই বিশ্রাম করুন।"

কাল সন্ধ্যায় একটা স্পেশাল সিনেমা দেখলাম। আমার জন্য অনেক যত্ন করে সংগ্রহ করেছে। 'একশ' বছর আগের বিশেষ বিশেষ দৃশ্য আর ঘটনাবলী। সবচেয়ে অভিভূত হলাম দুটো দৃশ্য দেখে। একটা হল, আমি আর অরূপ প্রথম ফ্রীজিং টেকনিক আবিষ্কার করে যে বিরাট অভিনন্দন পেয়েছিলাম তার দৃশ্য। দেখতে দেখতে খুব মন খারাপ হয়ে গেল। আমার সমসাময়িক সব পরিচিত মুখের কথা মনে পড়তে লাগল। অরূপ আর আমার দিল্লী আর লণ্ডন যাত্রা সবই দেখাল।

তার পরেরটা হচ্ছে আমার অন্তর্ধানের ঠিক পরেই—অরূপের প্রেস কনফারেন্স। সেখানে অরূপকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। অনেকে মনে হল অরূপকেই কিছু একটা খুনের দায়ে অভিযুক্ত করতে চাইছে। বেচারা অরূপ! আসল সত্য চেপে রাখতে গিয়ে ওর তো সত্যিই ভীষণ মুশকিল হয়েছিল।

তারপরের দৃশ্যটাও বেশ মজার। অরূপের মৃত্যুর পর অসীম বর্মনের সাংবাদিক বৈঠক, আসল ঘটনা প্রকাশ, আর তা নিয়ে হৈ হৈ। দু'একজন সাংবাদিক যাঁরা দুটোতেই এসেছেন তাঁরা বললেন যে, অরূপ যে কিছু জানে অথচ বলছে না, এটা তাঁরাও বুঝতে পেরেছিলেন। ব্যাপারটা রহস্যময় লাগলেও কিছু হদিস করতে তাঁরা পারেননি।

আমার সমসাময়িক কলকাতাকে দেখে আমি বেশ বুঝতে পারছি, মরে গেলে আর বাঁচা যায় না। আমি সত্যিই আর দশজনের মধ্যে বেঁচে নেই। আমি যেন পরকাল থেকে প্ল্যানচেট-এ নেমে এসেছি। আবার যে কোন সময় চলে যাব। জীবনটা এগিয়ে গেছে অনেক দূর। আমি আর সেটাকে ধরতে পারব না। তার ভেতর ঢুকতেও পারব না। যেটা তখন ভেবেছিলাম মজার একটা অভিজ্ঞতা হবে, এখন দেখছি সেটা একটা অর্থহীন পাগলামো মাত্র।

* * * কাল আমরা ইংলণ্ড যাত্রা করলাম।

সেই বিশেষ রহস্যটা ভেদ হল। সঙ্গে সুমিত্রা আর আমেদ ছিল। গাড়ি করে চলে গেলুম। শহর থেকে দূরে একটা বেশ ফাঁকা জায়গায়। মনে হল প্রথমটা যেন 'এয়ারপোর্ট'। তারপর দেখলাম, না, মাঠের মধ্যে বিশাল আণ্ডার-গ্রাউণ্ড টিউব স্টেশন। ব্যাপার কি, আমরা কি তবে টিউবে বিলেত যাত্রা করব?"

সুমিত্রা বলল, "ঠিক তাই ইণ্টার-কন্টিনেণ্টাল টানেল সমস্ত মহাদেশকে যুক্ত করেছে। সুড়ঙ্গ-গুলো খানিকটা চ্যাপ্টা U-এর মত। আপনাকে এঁকে দেখাচ্ছি।" বলে একটা গোল আঁকল।

"মনে করুন, এই বৃত্তটা পৃথিবীর একটা সেকশন। আমরা আছি 'ক' বিন্দুতে, আর কেম্ব্রিজ হল 'খ' বিন্দুতে। 'ক' থেকে ঢালু করে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে যদি এগিয়ে যান, আর মাঝপথে আবার উঠে যান, তাহলে 'খ'-তে পৌঁছবেন। মাধ্যাকর্ষণের জোরে 'ক' থেকে নামতে আপনার গতি বাড়বে যতক্ষণ ঢালু পথে যাচ্ছেন। ঢালুর মাঝপথে যখন আসবেন, তখন সেখানে যা আপনার গতিবেগ তা নিয়ে আপনি এবার ওপরে উঠে যাবেন। বিশেষ কোন এনার্জী খরচই হবে না।"

"কিন্তু 'ফ্রীকশন' তো আছে।"

"হ্যাঁ, তার জন্য কিছুটা গতি নষ্ট হবে। তাই বিশেষভাবে তৈরী সুড়ঙ্গে এয়ার কুশনের ওপর ওটা চলে, অনেকটা "হভারক্রাফ্‌ট্" (hovercraft) এর মত। আর নিজস্ব মোটর দিয়ে যেটুকুন স্পীড লস হয় তা পুষিয়ে নেয়, তা ছাড়া হাওয়ার সঙ্গে ঘর্ষণ কমানো হয় টানেলের ভেতরের হাওয়া পাতলা করে রেখে। তেলের অভাবের জন্য আজকাল এইভাবে যাওয়া-আসা খুব বেড়ে গেছে।"

"কিন্তু সুড়ঙ্গ খুঁড়তেই তো বিরাট খরচ হয়।"

"তা হয় বটে, তবে টানেলিং টেকনিকেরও উন্নতি হয়েছে। লেসার রশ্মির সাহায্যে টানেল করা হয়। তাই সমুদ্রের তলা দিয়ে এরকম গভীর সুড়ঙ্গ করা সম্ভব হয়েছে। এই পাতাল রেলে করে আমরা যাব।"

বলতে বলতে একদম সীল করা রকেট-এর মত দেখতে একটা বিরাট টিউব-ট্রেন এসে দাঁড়াল। আমরা একটা স্পেশাল কামরায় উঠে বসলাম। তারপর অবশ্য অত্যন্ত বিরক্তিকর যাত্রাটা। সুড়ঙ্গটা অন্ধকার। মোটা কাচের ছোট ছোট জানলা দিয়ে শুধু অন্ধকারই দেখা যাচ্ছে। তাই ওদের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাব মনে করলাম। ওরা বলল, "না, আপনার সঙ্গে এক ইংলিশ অধ্যাপকের আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি আপনার বিষয় জানেন। উনিই আপনাকে নিয়ে যাবেন, ওঁর সঙ্গে কথা বলুন।"

পাশের কামরা থেকে ভদ্রলোককে নিয়ে এল। আমারই বয়সী মনে হল। তারপরই মনে হল আমার ঘুমনোর আগের বয়স, এখনকার নয়। অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বয়স, একশো পঁয়তাল্লিশ নয়।

করমর্দন করেই তিনি বললেন, "আপনার মত একজন বৈজ্ঞানিকের সংস্পর্শে এসে আমি সত্যিই গর্বিত। সারা বিশ্ব আপনাকে দেখতে চায়। কিন্তু আপনি শুনলাম লুকিয়ে থাকতে চান। অবশ্য আপনার মানসিক অবস্থাটা আমরা কিছুটা বুঝি। বিশাল মানব-অরণ্যে আপনি একা বোধ করছেন। যত বেশী লোক দেখেন আপনার একাকীত্ব বেড়ে যায়। বলুন, আপনি আমাদের দেশের সম্বন্ধে কি জানতে চান?"

আমি বললাম, "দেখুন, আমার বন্ধুবান্ধব, পরিচিত লোক তো অনেকেই ওখানে ছিল। কিন্তু তাদের কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। আপনি মোটামুটি গোটাকতক অন্য কথা আমায় বলুন। প্রথমতঃ আমার সময়ে পূর্ব দুনিয়া আর

পশ্চিম দুনিয়াতে ছিল অনেক তফাৎ। এখন কি অবস্থা হয়েছে? রাজনীতির অবস্থাটাই বা কি, আর রাষ্ট্রসংঘের কি খবর? মানুষ কতটা পরস্পরের কাছে এসেছে?"

ডঃ জনসন বললেন, "দেখুন, বৈজ্ঞানিক হিসাবে আপনি খানিকটা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, সুতরাং আপনি বুঝতেই পারছেন যে, আরো যত বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে, তার ফলে পৃথিবীর মানুষ অনেক কাছে এসেছে।"

"হ্যাঁ, অনেকগুলো ব্যাপার তো দেখতেই পাচ্ছি। যেমন পাশপোর্ট, ভিসা প্রভৃতি উঠে গেছে, লোকের যে কোন দেশে বাস করার বাধা নেই; কিন্তু আমাদের সময়কার আণবিক অস্ত্রের ব্যাপারে খানিকটা সুরাহা কি হয়েছে?"

"তাও হয়েছে, প্রথম দিকে ব্যাপারটা খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। অনেক দেশই আস্তে আস্তে বোমা তৈরি শিখে গেল। কিন্তু তারপর ছোট ছোট দুটো দেশে, যাদের নাম আপনাকে বলব না, হঠাৎ বেধে গেল অ্যাটমিক লড়াই। হঠাৎই বেধে গেল, কারণ কেউই ভাবেনি, এত ছোট দেশের সাহস হবে এরকম সাংঘাতিক অস্ত্র প্রয়োগ করতে। ফলে শুধু ঐ দুটো দেশ প্রায় ধ্বংস হয়ে গেল। তা ছাড়া আপনাদের দেশগুলোরও বেশ সাংঘাতিক ক্ষতি হল। তখন পৃথিবীর সমস্ত দেশ একসঙ্গে স্থির করে, এ অস্ত্র ত্যাগ করা ছাড়া উপায় নেই। সব দেশ মিলে করে একটা নতুন সংগঠন। যার কাজ হল যাতে কোনো দেশে আণবিক অস্ত্র উৎপাদন না হয়, তার ব্যবস্থা করা। ব্যবস্থাটা বেশ সার্থক হয়েছে, কিন্তু হবার আগে দুটো ছোট ছোট দেশের আত্মহত্যা করার প্রয়োজন ছিল। হলও তাই। তবে আর একটা কথা, একদিকে পৃথিবীর মানুষ নিজেদের সংখ্যা-নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা পাকা করে ফেলল। আর একদিকে মূল খাদ্য-সমস্যা একদম মিটে গেল। তাই লড়াইয়ের জন্য খুব একটা দরকারও আর রইল না। তবে দেশে দেশে বিবাদ বিসংবাদ যে একেবারে চলে গেছে, তা নয়। নানান ব্যাপারে যথেষ্ট বিবাদ হয়, তবে কেউই আর সশস্ত্র সংঘাতের দিকে এগোতে চায় না। মোটামুটি বিশ্ব আদালত বা ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠান মারফৎ যে রায় বেরোয় সেটা বড় ছোট দেশ সবাই মেনে নেয়।"

নানান গল্প করতে করতে একদিন কেটে গেল। পরের দিন আমার সঙ্গীরা বলল, "এইবার লণ্ডন ইণ্টারকন্টিনেণ্টাল টিউব স্টেশন এসে যাচ্ছে। আমরা শীগ্‌গিরই টানেলের মুখ থেকে বেরিয়ে আসব। খানিক পরেই আলো দেখা গেল আর আমাদের ট্রেনটা থেমে গেল। বেরিয়ে দেখি ঠিক একটা বড় টিউব স্টেশন। নানান জাতের লোক, সাদা কালো সবাই ব্যস্ত হয়ে গাড়ি থেকে উঠছে নামছে। আমরাও নামলাম। তারপর ইংরেজ বন্ধুটির সঙ্গে একটা ছোট মোটরগাড়ি করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলাম।

* * *

লণ্ডন—সেপ্টেম্বর, ২০৭৬। আমি শেষ লণ্ডনে এসেছিলাম একশো দু' বছর আগে, একটা সম্মেলনে আমাদের পদ্ধতিটা আলোচনা করতে। আজ আবার এলাম। লণ্ডন বিশেষ বদলায়নি। মনে হয় বাড়ির সংখ্যা কিছু কম, গাছপালা বেশী। হোটেলে গিয়েই একটা মজার ব্যাপার দেখলাম। একজন বিজাতীয় লোক, বোধ হয় মধ্য ইউরোপের, ও হোটেল কাউণ্টারে এসে নিজের পকেট থেকে একটা ছোট স্পিকিং টিউব বার করল। একটা বোতাম টিপে দিল, আর বিজাতীয় কথাবার্তা বলতে লাগল। হোটেলের লোকটিও দেখি একটা চোঙায় ইংরেজীতেই জবাব দিয়ে যাচ্ছে, কানে তার হেড-ফোন। ইংরেজ বন্ধুকে বললাম, "ব্যাপারটা কি?"

তিনি বললেন, "'মিনিয়েচার ট্রান্সলেটর' বা 'ক্ষুদে অনুবাদক', যে কোন ভাষা থেকে অন্য কোন ভাষায় অনুবাদ করার যন্ত্র। আজকাল একদেশে অন্য দেশের লোক ব্যবহার করে। অবশ্য এতে কেবল সাধারণ কাজ চালান যায়, কারণ মোট পাঁচশ সাতশ কথার অনুবাদ সম্ভব হয়। তবে তার মধ্যে মোটামুটি অনেক কাজই চলে যায়।"

আমি বললাম, "কিন্তু এতগুলো ভাষার কথা, আর তার বিকল্প একটা যন্ত্রের মেমারিতে রাখা তো সম্ভব নয়।"

"না, তা তো বটেই। যন্ত্র একটাই, যে দেশে যাচ্ছেন সেই দেশের আর আপনার দেশের স্পেশাল টিউব নিতে হয়, তা না হলে চলে না। আপনি ইংরেজী জানেন, তাই আপনার দরকার নেই। তবু দেখতে চান তো হোটেলেই এক সেট ভাড়া পাওয়া যাবে। বাংলায় অবশ্য পাবেন না, তবে হিন্দীতে পাবেন। চলুন না, এক সেট নেওয়া যাক।"

একটা নিলাম, দেখলাম আমি হিন্দীতে মোটামুটি সাধারণ কথা বললে লাউড স্পীকারে সেটা থেকে ইংরেজীতে তার অনুবাদ বেরিয়ে আসে। আবার আমার সঙ্গী ইংরেজীতে জবাব দিলে সেটা আমার কাছে হিন্দী হয়ে আসছে। যন্ত্রটা খুব ছোট 'ওয়াকিং টকী'র মত। অবশ্য অনুবাদ হওয়াটা একটা নতুনত্ব।

লো টেম্পারেচার ল্যাবরেটরিতে গেলাম কেম্ব্রিজে। সেখানে আমার জানাশুনা বিখ্যাত অধ্যাপকদের ছবি আছে দেওয়ালে। কিন্তু তাদের কেউ তো আর থাকতে পারে না। একজন প্রায় পঁচাত্তর বছর বয়সের প্রাচীন অধ্যাপক, এখন রিটায়ার্ড। তাঁর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হল আগেকার দিনের। আমার মুখে পুরনো দিনের কথা শুনে তিনি কিছুটা অবাক্ হয়ে বললেন,

হোটেলের লোকটিও একটা চোঙায় ইংরেজীতে জবাব দিয়ে যাচ্ছে। [পৃষ্ঠা ৫০২

"Young man, তুমি এ সব কি করে জানলে? তোমার তো তখন জন্মই হয়নি?" তারপর বললেন, "আমাদের স্বর্গীয় প্রফেসর ম্যাকমিলান লো টেম্পারেচার ফিসিওলজিতে ভারতীয় অবদানের কথা বার বার বলতেন। বিশেষ করে Some Professor Dasgupta who used himself as a guineapig. By Jove, now that I seem to remember that professor has been revived-Wait a bit." বলেই একটা খবরের কাগজের থেকে একটা ফটো বার করে সেটাকে দেখলেন। বললেন, "You look remarkably like him. কিন্তু তিনি তো ভারতের বাইরে যেতে অস্বীকার করেছেন।"

আমি দেখলাম যে, ইনি প্রায় ধরে ফেলেছেন ব্যাপারটা। কোনরকমে ধামাচাপা দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম। তখনও তিনি বিড়বিড়

করছেন, "He looks rather similar, but then most Indians do look similar !"

কেম্ব্রিজ থেকে ফিরে দু'একদিন বিশ্রাম করে আমরা এবার রওনা দিলাম নিউইয়র্কের দিকে। আবার সেই পাতাল রেল। এবার অ্যাটলান্টিক পাড়ি দিলাম। নিউইয়র্কে পৌঁছে দেখলাম, শহরটা বেশ বদলে গেছে। আমেরিকানরা আমাদের সময় থেকেই এনভারনমেণ্ট (environment) নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়েছিল। এখন তাই সব শহরগুলো আগের চেয়ে শান্ত ও সবুজ পরিবেশ গড়ে তুলেছে। ওদের কর্মচাঞ্চল্য আগের মত অতটা নেই, আগের চেয়ে খানিকটা ধীর স্থির। কথাবার্তাতেও অনেকটা সৌম্য শান্ত ভাব এসেছে। কাপড়-জামা বেশ-ভূষা অনেকটা ঘরোয়া, যার যেটা ভাল লাগে পরে। মোটামুটি প্রাচ্যের প্রভাব ওদের ওপর পড়েছে

এখান থেকে বিশেষ ব্যবস্থা করে আমায় স্পেস সেণ্টারে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানকার অধ্যক্ষের কাছে আমার পরিচয় জানানো হল। তিনি তো শুনেই অবাক্, উত্তেজিত হয়ে সবাইকে ডাকতে যাচ্ছিলেন। তখন আমি বললাম, "না ডঃ হার্ভার্ড ! কাউকে বলবেন না। আমি এখন ছদ্ম পরিচয়ে আছি, এবং থাকতে চাই। তবে আপনাকে জানাগাম, কারণ আপনাদের যে একদল কর্মী দু' বছর হল চাঁদে একটা কলোনি গড়ে তুলেছে, তাদের মধ্যে একজন ভারতীয় আছে। তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"ও, আপনি অর্জুনের সঙ্গে কথা বলবেন ? তাকে জানলেন কি করে ?"

"তাকে নয়, তার ঠাকুর্দা আমার এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, আমরা ছিলাম একই গ্রামের মানুষ। আমি তার খবর নিতে এসেছি।"

"বেশ তো, আমি এখনি ব্যবস্থা করছি।" বলেই তিনি "মুন স্টেশন"কে ডাকলেন ট্রান্সমিটার সিগন্যালে। একটা টি. ভি. স্ক্রীনে মুন স্টেশনের টেলিভিশান রুমটা ভেসে উঠল। তারপর তিনি বললেন, "I want Arjun to come to the screen." বলতেই একটি বছর তিরিশের ভারতীয় যুবকের মূর্তি ফুটে উঠল। সে বলল, "কি খবর ডঃ হার্ভার্ড ?"

ডঃ হার্ভার্ড বললেন, "তোমার দেশের লোক এসেছেন দেখ, Prof. Biplab Dasgupta—the man from the past !"

অর্জুন কিছুটা থতমত খেয়ে গেল। সে বলল, "কি ব্যাপার ? কে বিপ্লব দাশগুপ্ত ?"

ডঃ হার্ভার্ড বললেন, "অর্জুন তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। তুমি না একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক, you don't even know your most famous man of science who froze himself."

এতক্ষণে অর্জুনের উপলব্ধি হল আমি কে। অবাক্ হয়ে স্ক্রীনে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "ক্ষমা করবেন, প্রফেসার দাশগুপ্ত। আপনি হচ্ছেন আমাদের একটা উপকথা, চন্দ্রলোক থেকে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল উলটো। আপনি যদি চন্দ্রলোক থেকে আমার সঙ্গে কথা বলতেন, তবেই বোধহয় ঠিক হত। আপনি তো ভারতীয় বিজ্ঞান জগতে দেবতার স্থান নিয়েছেন।"

বললাম, "অর্জুন, হলুদবাড়ি গ্রামে গিয়ে তোমাদের বাড়িতে তোমার ঠাকুর্দার ছবি দেখলাম। তিনি আমার বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন। তাই তুমি কিছুটা আমার নাতির মতন। অবশ্য তোমার ঠাকুর্দা বেঁচে থাকলে ১০৫ বছর বয়স হত। তিনি তো মারা গেছেন। প্রায় সত্তর বছর আগে।"

অর্জুন বলল, "হ্যাঁ, আমি জন্মাবার আগে, বাবার যখন তিরিশ বছর বয়েস, তখন তিনি মারা

যান। বাবা বেঁচে থাকলে তাঁর বয়সই প্রায় একশ' হয়ে যেত।"

হিসাবের অঙ্কে মাথা গোলমাল হয়ে গেল, তাই বললাম, "যাক ও কথা, চাঁদে তোমরা দু' বছর একটানা কাটাচ্ছ, কিরকম লাগছে?"

ও বলল, "অদ্ভুত বা ভীষণও বলতে পারেন। আমরা মোট পনেরো জন আছি, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই এই পনেরো জনের মনে হয় তারা যেন বিশ্বসংসারে একদম একা পড়ে গেছে, থাকতে থাকতে ক্রমেই আমাদের ব্যক্তিত্ব বদলে যাচ্ছে। তাই আমাদের মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন যে, এবার আবার পৃথিবীতে আমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।"

আমি বললাম, "অর্জুন, তোমরা পনেরো জনে একা মনে করছ, আর আমি পৃথিবীতে বসে লোক-জন ঘেরা, তবু ভীষণ একা লাগছে। আমার নিঃসঙ্গতাটা তুমি হয়ত কিছুটা বুঝবে। যাক ও কথা, ভালোয় ভালোয় ফিরে এস। তারপর তুমি ফিরলে তো একটা নেমন্তন্ন খাচ্ছি। লিপিকা তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। তোমাদের বাড়ির সকলেও তোমার খবর জানতে চেয়েছিলেন এবার তাহলে বিদায়!"

অর্জুনও হেসে বলল, "বিদায়।"

ডঃ হার্ভার্ডকে বিদায় জানিয়ে আমরা হোটেলে চলে এলাম, এবার দেশে ফেরা। আর আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করা।

আবার দেশে। একদিন বিশ্রামের পর পুরো মেডিকাল চেক-আপ হল। বড় হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ আমায় পরীক্ষা করে স্কায়াগ্রাম ইত্যাদি নিয়ে বললেন, "ডঃ দাশগুপ্ত, আপনি জানেন যে, আপনার হার্টের অবস্থা খুবই খারাপ!"

"হ্যাঁ, তা তো জানিই, সেইজন্যই তো এই পেরিমেণ্ট করেছিলাম।"

"তাহলে শুনুন, হার্ট-ট্রান্সপ্লান্ট এখন একটি অতি সাধারণ অপারেশন, আর আমাদের হাতে ব্যাঙ্কে যথেষ্ট হার্ট সংরক্ষিত আছে। আপনাকে আমরা অস্ত্রোপচার করে হার্ট বদলে দিলে আপনি পঁচিশ বা তিরিশ বছর সুস্থ শরীরে অনায়াসে থাকতে পারবেন।"

আমি বললাম, "ব্যাপারটা আমি ভেবে কালকে জবাব দেব।"

* *

সারারাত ভেবেছি। ভেবে দেখলাম, বিজ্ঞানের যে প্রশ্নটা জড়িয়ে ছিল আমার বাঁচার সঙ্গে, সেটা শেষ হয়ে গেছে। এখন যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই সম্পূর্ণ অপরিচিত জগতে নতুন করে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করে, আমার একঘেঁয়েমি আর একাকীত্ব ভোগ ছাড়া আর কি লাভ হবে? অপারেশন আমি করাব না। স্বাভাবিক ভাবেই যখন সময় হবে আমি আমার অসমাপ্ত নিদ্রা আবার শুরু করতে চাই।

*

তিন মাস পরের বুলেটিন।

আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্ত হৃদরোগে ভুগছিলেন। অস্ত্রোপচারে রাজী না হওয়ায় আমরা তাঁর ইচ্ছামত তাঁকে বিশ্রাম নিয়ে সাধারণ জীবনযাপন করতে দিয়েছি। গত রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় স্ট্রোকে মারা গেছেন এইভাবে বিপ্লব দাশগুপ্তের অদ্ভুত জীবন সমাপ্ত হল।

দিলীপ দাস

গদাই, এখন কেমন আছ?
ছেলেটার মাথা এখন ঠিক হলে হয়
মা, আমার কিচ্ছু হয়নি। খুব আনন্দে বক উড়ে যাওয়া দেখছিলুম।
এক বছর পর। দুর্গাপূজার সময়
বিজয়া হয়ে গেল, উনি মেদিনীপুরে গেছেন। কবে আসবেন জানিনা।
মা বাবা কবে আসবে?
এমন সময় -
বাড়ীতে কে আছেন?
কে!
আমি মেদিনীপুর থেকে আসছি
ঠাকুর মশায়....?
তিমি....নেই।
চন্দ্রমণি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন
মা-মা, চোখ চাও মা উঠ মা।

ক্ষুদিরামের মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত চন্দ্রমণিকে ঘিরে পাড়ার প্রতিবেশিনীরা
কি আর করবে বল। ভগবান দিয়েছেন, তিনিই নিয়েছেন।
তোমার গদাইকে আর সর্বমঙ্গলাকে মানুষ করার কথা ভাব

কিছুদিন পরে চন্দ্রমণির বড় ছেলে রামকুমার মাকে বলছে, পাশে রামেশ্বর
থাক বাবা ওকে জোর করো না। ভগবান যা করেন।
মা, গদাই অজ্ঞান হয়ে যাবার পর আর পাঠশালায় যাচ্ছে না

রামেশ্বর, গদাইকে দেখিস।

পিতার মৃত্যুর পর গদাই চিন্তাশীল হয়ে পড়ে। যা দেখে বা শোনে তার কি কারণ চিন্তা করে

একদিন টোলের সামনে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের পাঠ শুনছে
কেন এত কষ্ট করে পড়ছে? কি হয় পড়ে? বুঝেছি, গুড়ো করে দক্ষিণা ও চালকলা নেওয়ার জন্য!

(ক্রমশঃ)

সব্যসাচী

৩

"ডাইন !. ডাইন !" বলে উঠল হকিম।

"জাদুকর ! যদিও মুখোশ আলখাল্লা কিছুই নেই"—সায় দিল রোহান পাশা।

বেগম মরিয়ম শুধু নির্বাক্। তা তাঁর কমনীয় মুখখানিতে অসীম বিস্ময়ের যে ছাপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তাকে হকিম-পাশা কোম্পানির মনোভাবের সমর্থক বলে মনে করা যায় বই কি !

ওদিকে ন্যুমা মহারাজের জটাবদ্ধ কেশরে ঢুকিয়ে দিয়েছে ডান হাত, স্যাবর মহারানীর নির্লোম ব্রহ্মতালুতে ধীরে ধীরে আদুরে চাপড় মারছে বাঁ-হাত দিয়ে, এই অবস্থায় টারজান আলাপ জুড়ে দিয়েছে নবলব্ধ যুগল বন্ধুর সঙ্গে—

"টারজানকে জান তাহলে তোমরা !" বলছে সে। সিংহ-ভাষাতেই বলছে অবশ্য।

"বিলক্ষণ ! আমার রাজপদবি ঘুচিয়ে দিয়েছে যে দোপেয়ে জীব—"

নুম্যা আর কী বলতে যাচ্ছিল, তা মোটেই বলতে দিল না টারজান। ব্যস্ত ভাবে তাকে বাধা দিল এই বলে—"অরণ্যদেবতা বোঙ্গার দিব্যি, আমি কারও কোন্ পদবি খোয়াইনি। তোমরা ছিলে পশুরাজ, পশুরাজই আছ। আমার জন্যে তোমরা সবাই মিলে যে পদবি মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে বার করেছ, তা আনকোরা নতুন পদবি—'বনের রাজা'। পশুদের আমি রাজা নই বন্ধু। তোমরা আমাকে বন্ধু বলে মান যদি, আমি তাতেই ধন্য।"

বন্ধু জিনিসটা কী, বন্ধু হতে হলে কোন্ কোন্ বাধ্যবাধকতার মধ্যে যেতে হয়, সে-সম্পর্কে ন্যুমা স্যাবর জুটির ধারণা খুব স্পষ্ট নয়, তাই ও-প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে ন্যুমা চট করে অন্য কথায় চলে গেল। অন্য কথা, অনেক বেশী জরুরী কথা—"ঐ খাঁচায় তিন তিনটে দোপেয়ে রয়েছে, ওদের একটাকেও অন্ততঃ ফলার করতে না পারলে আমরা যে ক্ষিধেয় মারা যাই বন্ধু ! অথচ তোমার ভাবখানা যেন এই রকম যে, ওদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা আর না এগুলেই সুখী হও।"

"ক্ষিধেয় মারা যাও ?" —টারজান হো-হো

করে হেসে উঠল—"পশুরাজ ন্যুমা মারা যাবে ক্ষিধেয়? দাঁড়াও, দাঁড়াও—"

দল ছাড়া দু'টো হরিণ পাথুরে চাঙড়গুলোর আড়ালে আড়ালে চুপিসাড়ে পালাচ্ছে। হাওয়া বইছে সিংহদের দিক থেকে হরিণদের দিকে। কাজেই সিংহের গন্ধ, মানুষের গন্ধ হরিণেরা পাচ্ছে, হরিণের গন্ধ কেউই পাচ্ছে না—ন্যুমা বা স্যাবর বা টারজান। কিন্তু টারজানের ঐ শ্যেনচক্ষুর দৃষ্টি! চাঙড়ের আড়ালেও তা আবিষ্কার করেছে হরিণকে। "দাঁড়াও, দাঁড়াও"—বলতে বলতেই কাঁধ থেকে ধনুক নিয়ে সে চক্ষুর পলকে সেই অপস্রিয়মাণ হরিণদের দিকে তীর ছুঁড়ল।

"যাও বন্ধুরা, ফলার করগে। মাংসের সেরা হরিণের মাংস দিয়েই পেটের জ্বালা নিবারণ কর এবারকার মত। মনে রেখ বন্ধুকে—"

"আলবৎ"—ন্যুমা স্যাবরের দু'টো কণ্ঠ থেকে যুগপৎ হুঙ্কার বেরুল—"আলবৎ মনে রাখব বনের রাজাকে—"

লম্ফে লম্ফে তারা গিয়ে পড়ল ভূলুণ্ঠিত হরিণটার উপরে। টারজান দীর্ঘ-পদক্ষেপে গিয়ে হাজির হল হকিম-বেগম-পাশার সমুখে—"আবার দেখা হল মহাশয়-মহাশয়ারা। দামী মাল পাহারা দেবার জন্য এখনও কি তোমাদের এখানেই অবস্থান করার বাসনা? এবার কাছে ছিলাম, সিংহের ডাক শুনে ছুটে আসতে পেরেছি। পরের বার সিংহ যখন ডাকবে, তখন হয়ত আমি কাছে থাকব না—"

যিনি এ-যাবৎ কোন কথা বলেননি। টারজানের সঙ্গে ত নয়ই, নিজের সঙ্গী হকিম বা পাশার সঙ্গেও বলেননি, তিনি হঠাৎ কথা কয়ে উঠলেন এবার। হকিমের বা পাশার মত জংলী শব্দের ভেজাল-দেওয়া বন্য ইংরেজীতে নয়। চোস্ত, শুদ্ধ, স্বচ্ছন্দ ইংরেজীতে তিনি বললেন—

টারজান সেই অপস্রিয়মাণ হরিণের দিকে তীর ছুড়ল।

"আপনি যেই হোন, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। সেবার আপনার কথামত কাজ না করার দরুন প্রাণ হারাতে বসেছিলাম, এবার আর সে ভুল করব না। আপনি দয়া করে খাঁচার দোরটা আর একটু তুলে ধরুন, আমরা বেরুবার চেষ্টা করি—"

টারজান আর একটু এগিয়ে এল। সিংহদের কেরামতিতেই দোরটা উপরে উঠে গিয়েছে খানিকটা, দুই হাত দিয়ে সেটা সে আর একটু তুলে ধরল। প্রথমেই বেগম বেরুলেন, তারপরে রোহান পাশা, সবশেষে হকিম। হকিম বেচারীর

মনে আনন্দ নেই যেন। বেরুচ্ছে, আর পিছন-পানে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। পিছনে পড়ে রইল দামী মালে বোঝাই বাইশটা চামড়ার প্যাঁটরা।

হায়, এইভাবে ফেলে যাবে বলেই কি জীবন বিপন্ন করে প্লেনখানা হাইজ্যাক করল ওরা? চলন্ত বিমানের খোল থেকে একটা একটা করে কাঁধে করে তুলে নিয়ে এল হীরে-মুক্তো-বোঝাই চামড়ার পেটিগুলো? উঃ, এক একটা কম ভারী নাকি? কাঁধ ব্যথা হয়ে আছে এখনো। বন্দুক উঁচিয়ে প্লেনসুদ্ধ যাত্রীকে নিরস্ত্র রেখেছিলেন একা বেগম মরিয়ম। সে আর পাশা আর নারকুণ্ডা—

নরকে যাক নারকুণ্ডা। প্লেন অবশ্য এমনিও ধ্বংস হতে পারত, কিন্তু নারকুণ্ডা যে বেইমানি করেছিল, সে-পাপ ত আর খণ্ডন হতে পারে না তার দরুন—

বারে বারে পিছন পানে তাকায় হকিম, আর ভাবে এই সব কথা। তার ভাব দেখে টারজান মিষ্টি করে বলল—"তোমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে দোস্ত, মাল ছেড়ে চলে আসতে। তুমি না হয় থেকেই যাও। থাকলে অবশ্য সিংহের পেটে যাওয়া অনিবার্য, তবু ত শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পেটিগুলো চোখে চোখে রাখতে পারবে। সেও ত কম সান্ত্বনা নয়।"

আবার কথা কইলেন বেগম—"আমি একটা কথা বলি ভদ্র! আপনি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবেন এখন? সেটা কি কোন নিরাপদ আশ্রয়? সেটা কি নিকটে? যদি নিকটে হয়, তবে আমরা চেষ্টা করে বাক্সগুলোকে বয়ে নিয়ে যেতে পারি সেখানে। আমার কথা বিশ্বাস করুন, ওতে যে মণি-রত্নগুলি আছে, তার উপরে আমার দাবি পৃথিবীর অন্য সব মানুষের দাবির চাইতে বেশী। অন্যায় ভাবে আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আমি যদি অন্যায় ভাবেই তা আবার উদ্ধার করে থাকি, তাহলে আপনি হয়ত আমায় দোষী করবেন না। করবেন না, কারণ আপনি যে সামাজিক জীব নন। আপনাকে দেখে সেই ধারণাই আমাদের হয়েছে। সুতরাং সমাজ বা রাষ্ট্রের অসার বিধিনিষেধ আইন-কানুনকে অযৌক্তিক মর্যাদা হয়ত আপনি দেন না, হয়ত অবস্থা বিশেষে একটা প্লেনকে নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে ফিরিয়ে অন্যদিকে চালানোর জন্য পাইলটকে বাধ্য করার মত কাজকেও—"

বেগম উচ্ছ্বাসের বশে আরও অনেক কথাই বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু টারজান ওদিকে অস্থির হয়ে উঠেছে নারকুণ্ডার জন্য। মুলাংমুচকোর ক্রিয়ায় সে মোহাচ্ছন্ন ছিল, এখনও তা না থাকতে পারে হয়ত। জেগে উঠে সে যদি নড়াচড়া করতে যায় পোড়া-ঘায়ের ক্ষতি হবে তার। টারজানের যাওয়া দরকার—

সে বেগমের কথায় বাধা দিয়ে শান্তভাবেই বলল—"দেখুন মাদাম, কতগুলো কাজ আছে, যা মূলতঃ ন্যায্য। যেমন ধরুন, দুঃখীকে দয়া করা, বিদেশী শত্রুর আক্রমণ ঘটলে দেশরক্ষার জন্য অস্ত্র-ধারণ করা—এইসব আর কি। এ ছাড়া অন্য কাজ অধিকাংশই স্থান কাল পাত্র-ভেদে কখনো হয় ন্যায়, কখনো হয় অন্যায়। সামাজিক জীব ঠিক এই মুহূর্তে আমি নই, কিন্তু সমাজ রাষ্ট্র আইন-কানুন সম্পর্কে যেটুকু অভিজ্ঞতা আমার আছে, তার ভিত্তিতে এটুকু আমি অনায়াসেই মেনে নিতে পারি যে, ক্ষেত্রবিশেষে হাইজ্যাকিংও তেমন নিন্দার্হ না হতে পারে বইকি!"

"হাইজ্যাকিং!"—বেগম অবাক্ হয়ে বললেন—"এ-শব্দটা আপনি জানেন? তাহলে ত বোধহয় আমাদের ধারণা আগাগোড়াই ভুল! শব্দটা যে একান্ত আধুনিক! আর খবরের কাগজওয়ালা আর বিপ্লব-অন্তর্ঘাত-টাত নিয়ে মাথা ঘামানে-

ওয়ালারা ছাড়া ও-শব্দটা ব্যবহারও করে না কেউ। এই অরণ্যে বসে সিংহ-সিংহিনীদের সঙ্গে দহরম-মহরম করতে করতে হাইজ্যাকিংয়ের ব্যাপার সম্পর্কে আপনি ওয়াকিবহাল হলেন কেমন করে?"

"আমি ইউরোপ থেকে এসেছি মাত্র দিন পনেরো আগে"—হেসে ফেলল টারজান—"কিন্তু সে কথা থাকুক। আমি একটা আশ্রয়ের সন্ধান পেয়েছি, নিরাপদ সেটা নিশ্চয়ই। আপনারা সেখানে নিরাপদে থাকবেন, নিরাপদ থাকবে আপনাদের বাক্স-প্যাঁটরাও। চিন্তা আমি আপনাদের জন্য করছি না। করছি নারকুণ্ডার জন্য—"

"নারকুণ্ডা?"—এবারে বেগমের প্রশ্নে সুর মেলাতে শোনা গেল হকিম আর পাশা দু'জনকেই।

"হ্যাঁ, নারকুণ্ডাকেও সেখানেই রেখেছি কিনা! আপনাদেরও সেখানে নিয়ে যাই যদি, নারকুণ্ডার দিক থেকে আপনাদের ভয় করার কিছু নেই আপাততঃ, কারণ আরও অন্ততঃ একটা হপ্তা তার দেহে নড়াচড়ার শক্তিই ফিরে আসছে না। আমার ভয়, পাছে আপনারা অসহায় নারকুণ্ডাকে মেরে ফেলেন আমার অসাক্ষাতে। সে ত শত্রু আপনাদের! আর আমাকেও খাদ্যের সন্ধানে এক একবার বেরুতেই হবে গুহা থেকে।"

বেগম একবার পাশার, একবার হকিমের দিকে তাকালেন। হকিম ততক্ষণে সত্যিসত্যিই বেরিয়ে এসেছে, প্যাঁটরার মায়া কাটিয়ে।

তাদের দুজনের সঙ্গে চোখেচোখেই একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল বুঝি বেগমের। তিনি এবার বললেন—"আপনার দয়ায় আমরা প্রাণে বেঁচেছি। এখন নিরাপদ আশ্রয়ও পেতে যাচ্ছি আপনারই দয়ায়। সেই কৃতজ্ঞতার বশেই আমরা কথা দিচ্ছি যে, আপনার গুহায় আমরা যতদিন থাকব, নারকুণ্ডার কোন ক্ষতিই আমরা করব না। তবে, নারকুণ্ডাও আমাদের ক্ষতি না করে, সেটাও আপনি দেখবেন অবশ্য।"

অতঃপর সবাই কাজে লেগে গেল। বেগম মরিয়মও তৈরি হয়েছিলেন একটা প্যাঁটরা মাথায় তুলে নিতে। টারজান হেসে তাঁকে নিবৃত্ত করল—"আমাদের পৌরুষগর্বে অতখানি আঘাত করবেন না দয়া করে। বাইশটা আছে বলছিলেন ত? বার তিনেকে আমরা পেরে যাব—কী বলেন, হকিম সাব, পাশা সাব?"

"আপনি কেন তকলিফ করবেন?"—সমস্বরে আপত্তি উঠল বেগম, হকিম এবং পাশার কণ্ঠ থেকে। বেগমের আপত্তিতে আন্তরিকতার সুর ফুটে ছিল। কিন্তু অন্য দুইজন যে টারজানের দিক থেকে অযাচিত সাহায্য পাওয়া যাবে শুনে বিলক্ষণ পুলকিত হয়ে উঠেছে, তা আর গোপন রইল না টারজানের কাছ থেকে। সে নিজেই ঢুকল খাঁচার ভিতরে। আর তার পিছনের অংশে সারিবন্দী করে সযত্নে সাজানো পেটিগুলি ঠেলে দিতে লাগল দরোজার দিকে—"নামিয়ে ফেলুন গোটা পাঁচ ছয়—"

"পাঁচ ছয়টা একসঙ্গে কেন নামাবেন?"—বললেন বেগম—"তিনজনে তিনটি। বাদবাকী এখন ভিতরেই থাকুক।"

সে কথায় কান না দিয়ে টারজান ছয়টা ঠেলে দিল দরোজার মুখে, আর নেমে এসে নিজের মাথায় তুলে নিল একটা, তারপর পাশাকে বলল, "আর একটা চাপিয়ে দিন এর উপরে।" তারপর দুই বগলে দুটো চেপে ধরে এগিয়ে চলল দৃঢ়পদে। চার পেটির সমবেত ওজন ছয় মণের বেশী হবে ত কম হবে না।

অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখার সময় নেই, দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে টারজান হাঁক দিচ্ছে—"আমার ঠিক পিছনে পিছনে আসুন আপনারা।

সিংহেরা এতক্ষণ হরিণ খেয়ে শেষ করেছে। ক্ষিদে তাদের মিটেছে বলে মনে হয় না। আমার থেকে বেশী পিছনে পড়েন যদি, বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা আছে।"

দেড়মণি পেটি মাথায় নিয়ে টারজানের সঙ্গে সমান তালে হাঁটা যায়? পাশা হকিমের হাঁস-ফাঁস দশা দেখে বেগম মিনতি করে বললেন —"বন্ধু, একটু ধীরে, একটু ধীরে চলুন, তা নইলে এরা হয় সিংহের পেটে যাবে, নয় ত হার্টের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যাবে।"

"তা ঠিক বলেছেন"—বলে গতি মন্থর করল টারজান—"আমি অস্থির হচ্ছি নারকুণ্ডার জন্য। আপনার কথায় আমি অবিশ্বাস করি না। সে হয়ত সত্যিই নারকী, কিন্তু আমি তার বিচারক নই, যতক্ষণ আমার আশ্রয়ে সে আছে।"

"এই খাড়া পাহাড় বেয়ে আমরা উঠব কেমন করে?"—গুহার নীচে দাঁড়িয়ে হতাশভাবে উপর পানে চাইতে লাগলেন বেগম।

পেটিগুলো নামিয়ে রেখে টারজান কাঁধ থেকে নামাল ঘাসের দড়ির গোছা। "কিছু মনে করবেন না"—বলে বেগমের কোমর পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধল তার একপ্রান্ত, তারপর বলল —"আপনি দুই হাত দিয়ে দড়িটা ধরে থাকবেন আর কিছু করতে হবে না। হাতে রুমাল জড়িয়ে নিলে আরও ভাল হয়। দড়ি খসখসে, ছড়ে যেতে পারে হাত।"

সেই দড়িরই অপর প্রান্ত কোমরে গুঁজে কাঠবেড়ালের মত অনায়াসে পাহাড় বেয়ে উঠে গেল টারজান। উঠতে অবশ্য বেশী দূর হবে না, মাত্র দশ ফুট। গুহার সমুখে একটা চাতাল থাকলে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে বেয়ে ওঠারও দরকার হত না তার, দূর থেকে দৌড়ে এসে উপর পানে একটা লাফ দিলেই ওটুকু উঁচুতে সে স্বচ্ছন্দে উঠে যেতে পারত।

যা হোক, উপরে উঠেই একবার সে গুহার ভিতরটা দেখে নিল। নিশ্চিন্তি! নারকুণ্ডাকে যেভাবে রেখে গিয়েছিল, ঠিক সেই ভাবেই সে পড়ে আছে। জ্ঞান এখনও ফেরেনি তার। মুলাংমুচকো তার নিজের কাজ করে যাচ্ছে।

এইবার টারজান দড়ি ধরে টান শুরু করল— "কোন ভয় নেই। শুধু দেখবেন, পাহাড়ের সঙ্গে যেন গায়ের ঘষা না লাগে আপনার।"

আধ মিনিটের মধ্যে বেগম মরিয়মকে গুহার ভিতরে তুলে ফেলল টারজান। বেগম ভিতরে ঢুকেই বিতৃষ্ণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন নারকুণ্ডার অচেতন দেহের দিকে। একটিবার মাত্র। তারপরই সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। টারজান বুঝি একটু বিব্রতই বোধ করল। শত্রুর সঙ্গে একত্র বসবাস কারও পক্ষেই আনন্দের নয়। এ-মহিলা নিশ্চয়ই ঘোরতর অস্বস্তি বোধ করবেন নারকুণ্ডার সান্নিধ্যের দরুন। দেখা যাক, এর কী প্রতীকার করা যায়!

এখন প্রথম কাজ হল বেগমকে ও তাঁর দুই বাহনকে কিছু খেতে দেওয়া। কী খেতে দেওয়া যেতে পারে? দেওয়া যেতে পারে পক্ক রম্ভা। পাহাড়ের সারা অঙ্গ বনে বনে সমাচ্ছন্ন, আর সে বন বলতে গেলে কলারই বন। এসব অঞ্চলের কলা আকারেও বৃহৎ, স্বাদেও মধুর। মুশকিল হয় এই যে, সুপক্ক ফলগুলিকে অক্ষত অবস্থায় কদাচিৎ পাওয়া যায়। বানরে খায়, পাখিতে ঠুকরে ঠুকরে নষ্ট করে। টারজান নিজে অবশ্য ষোলো-আনা মাংসাশী জীব, ফল-ফুলুরি সে খায় শুধু তখন, মাংস যখন মেলে না বনাঞ্চলে। তেমন দুর্দৈব মাঝে মাঝে হয় বই কি! হয়, যখন অরণ্যজীবদের মধ্যে হিংস্রতম যে চিতা, সেই চিতার

দল উন্মত্ত হয়ে ওঠে হিংসার নেশায়। খাদ্যের জন্য যা প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশী হরিণ তারা মেরে ফেলে তখন। যে সব হরিণ বেঁচে যায়, তারা প্রাণ নিয়ে সরে পড়ে দূর দূর বনাঞ্চলে। সেই সেই সময়ে টারজান যদি এসে পড়ে সেই হরিণশূন্য অরণ্যে, আর সেখানে দুই চার দিন থাকতে বাধ্য হয় কোন কারণে, তাহলেই, একান্ত নিরুপায় হয়েই, কদলী ভোজনে জঠরজ্বালা নিবৃত্তির মত হীন কাজ সে করে থাকে বাধ্য হয়ে।

আজ, এখনও তেমন ক্ষুধা সে বোধ করছে না। কারণ প্রাতরাশটি সে সুসম্পন্ন করেছে একটা আস্ত হরিণের বারো-আনা আন্দাজ রক্ত-মাংস উদরে প্রেরণ করে। সন্ধ্যা পর্যন্ত পেট ঠাণ্ডা থাকবে আশা করা যায়। খাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করবে, নিশীথ শয্যায় অঙ্গ ঢেলে দেবার আগে।

না, নিজের জন্য নয়। বেগম মরিয়মের জন্য কদলী আহরণের উদ্দেশে সে বেরুল এবার। ঐ যে দেখা যায় কলাবনটা। সিকি মাইলের ভিতরেই। আধ ঘণ্টার ভিতর সে অবশ্যই ফিরবে। যাওয়ার সময় পাশা আর হকিমকে ডেকে সে বলে গেল—"তোমাদের এখন উপরে ওঠা তো নিষ্প্রয়োজন! বাকী পেটিগুলিও তো আনতে চাও তোমরা! সবগুলো এনে তার উপর গুহায় ঢুকে আরাম কর এখন। আমি কলা নিয়ে এসে তারপর তোমাদের নিয়ে যাব প্লেনে।"

"আমরা ততক্ষণ একবার নিজেরাই ঘুরে আসি না?" বলল ওরা।

"যেতে পার। তবে গেলে আর না-ও ফিরতে পার। সিংহেরা নিকটেই আছে।"

"সিংহেরা ত এখানে এসেও—"

"ধরে নিয়ে যেতে পারে তোমাদের? তা পারে, যদি তোমরা চোখ কান খোলা না রাখ। সিংহ দেখলে চ্যাঁচাতে পারবে না? আমি তো

সেই বাহুই পাশার গলাটা টিপে ধরে টেনে তুলল [পৃষ্ঠা ৫১৪

কাছেই আছি আমার হাঁক শুনলেই ওরা দূরে সরে যাবে।"

টারজান আর দাঁড়াল না জোর পায়ে ছুটল কলাবনের দিকে।

বেগম গুহার দরোজায় দাঁড়িয়ে পাশা আর হকিমকে ডেকে বললেন—"তোমরা সাবধানে থেক। মানে—সিংহের সম্পর্কে সাবধান। আমি বড়ই অবসন্ন হয়ে পড়েছি, একটু শুয়ে বিশ্রাম করব, যতক্ষণ আশ্রয়দাতা ফিরে না আসেন।"

"নারকুণ্ডার কী হাল?"—জিজ্ঞাসা করে পাশা।

"অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।"—তিক্ত স্বরে উত্তর দিলেন বেগম—"কী করা যাবে, কথা দিয়েছি,

পাষণ্ডের কোন ক্ষতি আমরা করব না, যতক্ষণ ঐ বন্য ভদ্রলোকের আশ্রয়ে থাকছি। তা নইলে—"

"তা নইলে, এই ছিল ওকে সাজা দেবার সুবর্ণ সুযোগ! যা হোক, কথা যখন দিয়েছেন, তার ত খেলাপ করা যায় না! আপনি ঘুমোন একটু। আরও কত ঝড় আমাদের মাথার উপর দিয়ে যাবে এখনও, তার তো ঠিক নেই কিছু! ঘুমিয়ে নিন, যতটুকু পারেন।"

বেগমকে ঘুমোবার উপদেশ দিয়ে পাশা আর হকিম ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। ফিসফিস করে কথা কইতে লাগল। ফিসফিস করে। যদিও, মাথার উপরে ঐ গুহার আশ্রয়ে মরিয়ম বেগম ছাড়া এমন অন্য কেউ ধারে কাছে নেই, যে শুনে ফেলতে পারে তাদের কথা।

কথা শেষ হতে দুই মিনিটের বেশী লাগল না তাদের। তারপর তারা উঠে বসল দুজনে। পাশা চাপল হকিমের কাঁধে। হকিম যখন উঠে দাঁড়াল, তখন পাশার মাথা গুহার দরোজার সামনেই। দরোজারই এক কোণ চেপে ধরে পাশা লাফিয়ে উঠল নিঃশব্দে। নিঃশব্দ চরণে ঢুকে পড়ল গুহায়। বেগম ঘুমিয়ে পড়েছেন। অন্য পাশে অজ্ঞান হয়ে আছে নারকুণ্ডা। পাশা এগিয়ে গেল নারকুণ্ডার দিকে। চোখে তার চিতার মত হিংস্র দৃষ্টি।

কোন শব্দই পাননি, তবু বেগম হঠাৎ জেগে উঠলেন। জেগেই তিনি তাকালেন নারকুণ্ডার দিকে। কী সর্বনাশ! নারকুণ্ডার বুকের উপর চেপে বসে তার গলা টিপে ধরেছে পাশা। "কর কী কর কী?"—একটা চিৎকার বেগমের মুখ থেকে, তারপরই তিনি ছুটে গেলেন পাশাকে নিরস্ত করবার জন্য!

দুই পা ফেলবার আগেই কিন্তু তাঁকে ধরে ফেলল পিছন থেকে একখানা সবল বাহু। এক ঝটকায় তাঁকে পাশে সরিয়ে দিয়ে সেই বাহুই পাশার গলাটা টিপে ধরে টেনে তুলল নারকুণ্ডার বুকের উপর থেকে। বাজপাখির নখে বেঁধা সাপ যেমন ঝুলতে ঝুলতে মোচড় খায় শূন্যে, পাশা ঠিক তেমনি মোচড় খেতে লাগল টারজানের বজ্রহস্তের পেষণে।

"ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, মরে গেল যে!"—ককিয়ে উঠলেন বেগম।

"এই যে দিই ছেড়ে"—বলে টারজান পাশাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল একেবারে পাহাড়ের নীচে।

তারপরে টারজান এগিয়ে গেল নারকুণ্ডার দিকে, পরীক্ষা করে দেখল তাকে—তারপর একটা কর্কশ হাসি হেসে বেগমের কাছে এসে বলল—"আপনার লাগেনি ত? নারকুণ্ডা মরে গিয়েছে! তা তাতে আপনার দোষ ছিল না, আপনার চিৎকার শুনেই আমি বুঝতে পেরেছি। কিছু ভাল কলা এনেছি। খান। ঐ কোণে একটা জলের ধারাও আছে—" (ক্রমশঃ)

প্রশ্ন ১০

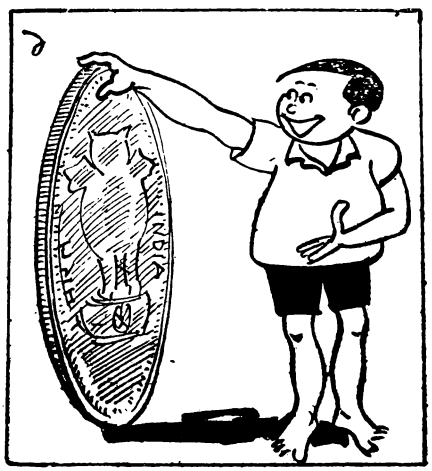

কতগুলো টাকা গায়ের উপর গায়ে শোয়ালে একটা দাঁড়ানো টাকার সমান হবে?

(না পারলে ৫২২ পৃষ্ঠায় দেখ)

পিকনিক

শ্রীসুগত সেনগুপ্ত

রবিবার দিন সকালবেলায় মিত্তিরদের প্রশস্ত রোয়াকে বসে আমাদের 'পঞ্চ-পাণ্ডব' দলের জোর মিটিং চলছিলো। 'পঞ্চ-পাণ্ডব' বলতে আমি, বোঁচা, গজা, পচা এবং..... ? এবং আমাদের দলপতি ক্যাবলাদা। আমাদের আলোচনার বিষয় :—পিকনিক। ক্যাবলাদা হাত-পা নেড়ে অনেকটা মিনিস্টারের লেকচার দেওয়ার ভঙ্গিতে আমাদের পিকনিকের ব্যাপারে অনেক কিছু বোঝাচ্ছিলো। বলছিলো,—"সামনেই ক্রিসমাস। পিকনিক করবার এটাই হল উপযুক্ত সময়। তোরা যদি পিকনিক করতে যেতে চাস তো আমার সঙ্গে যেতে পারিস।"

আমরা চারজন (আমি, বোঁচা, গজা, পচা) সমস্বরে বলে উঠলুম,—"কোথায় ক্যাবলাদা ?"

ক্যাবলাদা গম্ভীর গলায় বললো —"চন্দনপুরে

পচা হঠাৎ ফস করে বলে উঠলো,—"চন্দনপুরে! সেখানে কে থাকেন ?"

—"অত খোঁজে তোর দরকার কি ? তোরা আমার সঙ্গে বড়দিনের দিন চন্দনপুরে পিকনিক করতে যেতে রাজী আছিস কিনা বল। মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিসনি, আমার মাথা ধরেছে।" গম্ভীর মুখে এতগুলি কথা বলে দম নেবার জন্যে একটু থামলো ক্যাবলাদা।

আমরা এবারে বললুম,—"আমরা যেতে রাজী আছি ক্যাবলাদা।"

—"ভেরী গুড। আমি জানতুম তোরা রাজী না হয়ে পারবি না। তাহলে আর বেশী দেরি না করে দুর্গা দুর্গা বলে ফিস্টের লিস্ট করতে শুরু কর। আর একটা কথা বলে রাখি। প্রত্যেককে পিকনিকের জন্য 'যুক্ত সংঘের' (আমাদের পঞ্চ-

পাণ্ডবের ক্লাবের নাম) তহবিলে দশ টাকা করে চাঁদা দিতে হবে। কিন্তু আমি দেব ন'টাকা নিরানব্বুই পয়সা!"

আমি বললুম,—"কেন ক্যাবলাদা? তুমি এক পয়সা কম চাঁদা দেবে কেন?"

—"সেটাই নিয়ম। তা না হলে দলপতির মর্যাদা থাকে না!"

আমি পুনরায় বলতে যাচ্ছিলুম,—"কিন্তু ক্যাবলাদা···।"

—"শাট্ আপ কোন কিন্তু-টিন্তু নয়। যা বললুম তাই কর। কাম অধিক, বাত কম। বিদ্যাসাগর না জহরলাল কে যেন বলেছিলেন কথাটা!" কথাগুলো দিব্যি অম্লান বদনে বলে গেল ক্যাবলাদা।

অগত্যা আমরা আর কোন কথা না বলে ফিস্টের লিস্ট করতে লেগে গেলুম। আর ক্যাবলাদা একটা ফুচকাওয়ালা ডেকে, দিব্যি খোশ মেজাজে ফুচকা খেতে লাগলো তিরিশ পয়সার ফুচকা খাওয়ার পর, ঘড়ি ধরে পাকা সাড়ে সাত মিনিট ফুচকাওয়ালাকে রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে রাখলো ক্যাবলাদা। ফুচকাওয়ালা বিরক্ত হয়ে চেঁচামেচি শুরু করতে বাধ্য হলে ক্যাবলাদা জামার পকেটে হাত চালিয়ে পয়সা বের করলো। তারপর পয়সাগুলো ফুচকাওয়ালাকে দিলো। ফুচকাওয়ালা গুনে বললো,—"বাবু, উনত্রিশ পয়সা? এক পয়সা কম?"

—"ইয়েস্। পাওনাদারকে সঠিক পয়সা দিলে দলপতির মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়।" দাম্ভিক চালে বললো ক্যাবলাদা।

ফুচকাওয়ালাটা ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে "রাম রাম" বলে চলে গেল। আর আমরা এই প্রথম ক্যাবলাদাকে নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ করে ফুচকা খেতে দেখলুম

বনভোজনের ফর্দ করা হয়ে গেছে। লিস্টে আইটেম ছিলো,—ফ্রায়েড রাইস্, পাঁঠার মাংস, পোনামাছের কালিয়া, পাঁপড়ভাজা, চাটনি, দই আর মিষ্টি। আইটেমগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ক্যাবলাদা বললো,—"বাঃ, বেশ হয়েছে।"

পচা বললো,—"এর সঙ্গে উচ্ছের পায়েস করলে আরও ভাল হতো!"

—"ইডিয়ট্। দূর হ এখান থেকে। হচ্ছে ভালো ভালো মোগলাই খাবারের কথা, আর হতচ্ছাড়াটা কিনা এর মধ্যে উচ্ছের পায়েস টেনে নিয়ে এলো। এই গাড়োলগুলোর কাছে কিছু বলতে যাওয়াই ঝকমারি।" ক্যাবলাদা বললো।

আমি দেখলুম বেগতিক, ক্যাবলাদা ক্ষেপে গেছে। তাই কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলুম। বললুম,—"ক্যাবলাদা, চন্দনপুর যেতে-আসতে ট্রেনভাড়া লাগবে না?"

—"একদম না। বিনা-টিকিটে চন্দনপুর যাওয়া হবে, এবং তথা হইতে আবার কলকাতায় আসাও হবে। ট্রেনের পকেটমার থেকে জেনারেল ম্যানেজার পর্যন্ত সবাই আমার পরিচিত। অতএব কুছপরোয়া নেহি।" ভাঁটের মাথায় কথাগুলো বলে গেল ক্যাবলাদা।

আমি বললুম,—"কিন্তু আজ ১৮ই ডিসেম্বর। আর মাত্র সাত দিন সময় আছে হাতে।"

ক্যাবলাদা বললো,—"এনাফ টাইম। সব ম্যানেজ হয়ে যাবে।"

আমরা বললুম,—"অল্ রাইট্।"

* * *

চন্দনপুর কলকাতা থেকে খুব বেশী দূর নয়। ইলেকট্রিক ট্রেনে চড়লে মাত্র মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই সেখানে পৌঁছন যায়। নির্দিষ্ট দিনে আমরা পঞ্চ-পাণ্ডব যখন ট্রেন থেকে চন্দনপুর স্টেশনে নামলাম, তখন ঘড়িতে বাজে বেলা ন'টা।

শীতকালের চনমনে রৌদ্র স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে আমাদের অল্পবিস্তর লটবহর ছিল। হাঁড়ি, ডেকচি, বাটি, হাতা, চামচ, শালপাতা আর মাটির গ্লাস ইত্যাদি ইত্যাদি। এ-ছাড়া রাঁধবার মাল-মসলা তো আছেই! হাঁড়ি, ডেকচি প্রভৃতি জিনিসগুলো আমরা যে যার বাড়ি থেকে ম্যানেজ করেছি। কেবল হাতা আর চামচগুলোই অনন্তদার "ভোজনিকা" রেস্টুরেণ্ট থেকে আমদানি করা হয়েছে। ভাগ্য আমাদের খুবই ভালো ছিল বলতে হবে। অত লটবহর নিয়ে বিনা-টিকিটে হাওড়া থেকে চন্দনপুরে দিব্যি গদাই-লশকরী চালে চলে এলুম। ধরা তো দূরের কথা, কেউ আমাদের সন্দেহই করেনি। আর করলেও কোন ক্ষতি ছিল না। কারণ, রেল-কোম্পানির ওয়াগান ব্রেকার থেকে আরম্ভ করে জেনারেল ম্যানেজার পর্যন্ত সবাই আমাদের লীডার ক্যাবলাদার পরিচিত!

পিকনিকের জন্য আমাদের চাঁদা উঠেছে সর্বসাকুল্যে ঊনপঞ্চাশ টাকা নিরানব্বুই পয়সা মাত্র! আমরা চারজন (আমি, বোঁচা, গজা, পচা) দশ টাকা করেই চাঁদা দিয়েছি, আর ক্যাবলাদা দলপতির মর্যাদা রক্ষার্থে দিয়েছে ন'টাকা নিরানব্বুই পয়সা! এত অল্প টাকায় ঘটা করে পিকনিক করা সম্ভব নয়। সেই জন্য পিকনিকের 'মেন্যু'র কিছু রদবদল করা হয়েছে। যেমন ফ্রায়েড রাইসের বদলে খিচুড়ি, আর চাটনির বদলে বেলের মোরব্বার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বেলের মোরব্বাও আবার পয়সা দিয়ে কেনা নয়। সেটা গজা ওর ঠাকুমার আচারের জার থেকে হাতিয়েছে! খাদ্য-তালিকার আর একটা প্রধান আকর্ষণ ছিলো দই। কিন্তু সে দই এখন বেমালুম বেপাত্তা। অন্যান্য আইটেমগুলো অবশ্য অপরিবর্তিতই রয়েছে।

স্টেশনের বাইরে এসে তিনখানা সাইকেল রিকশা ভাড়া করা হলো। রিকশাওয়ালাদের ক্যাবলাদা কি একটা জায়গার নাম বললো। তারা যেতে রাজী হলো। অতঃপর আমরা পঞ্চ-পাণ্ডব লটবহর নিয়ে ভাগাভাগি করে তিনটে রিকশায় চড়ে বসলুম। আমি আর ক্যাবলাদা একটা রিকশায়। বোঁচা এবং গজা আর একটা রিকশায়, এবং পচা তৃতীয় রিকশাটায়। তেল, মসলা প্রভৃতি যাবতীয় রাঁধবার সরঞ্জাম সব পচার রিকশাতেই তোলা হয়েছে। কিছু বাসনও। মালের চাপে বেচারি পচা একেবারে বিপর্যস্ত।

যেতে যেতে ক্যাবলাদা আমায় বললো,—"আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেটা হলো আমার আপন পিসেমশায়ের বাগানবাড়ি। চমৎকার পরিবেশ সেখানে। পিসেমশাই এখন এখানে নেই, বেনারসে গেছেন তপস্যা করতে। মালী আছে। সুতরাং জমিয়ে পিকনিক করা যাবে।" ক্যাবলাদা আরও কি বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু বলা হলো না! সেই মুহূর্তে সেখানে ঘটলো একটি অভূতপূর্ব ঘটনা···।

পচার রিকশাটা যাচ্ছিলো সবার আগে আগে। যেতে যেতে হঠাৎ রিকশাটার ব্রেক ফেল করে। সেই সময়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো দু'জন পুলিস। রিকশাটা সোজা গিয়ে তাদের পেছনে ধাক্কা মারে সজোরে। "হায় রাম" বলে দু'জন পুলিসই রাস্তার দু'দিকে ছিটকে পড়ে। টাল সামলাতে না পেরে রিকশাওয়ালাও গোটা রিকশাটা নিয়ে রাস্তার ওপর উলটে পড়লো!

রিকশার তিনটে চাকাই আকাশের দিকে! হতভাগ্য পচার হাতে ছিলো একটা ছোট্ট ব্যাগ। ব্যাগে লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ ইত্যাদি ছিলো। ছিটকে পড়ার ফলে সেই ব্যাগ যায় ফেটে। আর ঠোঙা ছিঁড়ে সমস্ত লঙ্কার গুঁড়োর স্রোত গিয়ে পড়লো

সেই পুলিস দু'টোর মুখের ওপর! যন্ত্রণায় তারা ককিয়ে উঠলো, হাত-পা তুলে নাচতে লাগলো তা-থৈ নাচ! সে নাচের কাছে কোথায় লাগে ভারতনাট্যম্!

এর পর কি হলো, তা আর তোমাদের শুনে কাজ নেই। সে এক বিশ্রী অবস্থা! মুহূর্তে সেখানে হাজার লোকের ভিড় জমে গেল। যন্ত্রণায় পুলিস দুটোর চোখ প্রায় কানা হয়ে যাবার উপক্রম। বেচারী পচা ওর চালকুমড়োর মত শরীর নিয়ে গড়াতে গড়াতে রাস্তার পাশের এক দুর্গন্ধময় ড্রেনের মধ্যে গিয়ে পড়েছে! সর্বাঙ্গে কাদা মাখামাখি! রিকশাওয়ালার থুতনির কাছ থেকে অনেকখানি জায়গা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে, তার শৌখিন টিকিটা রিকশার চাকার রীমের সঙ্গে জড়িয়ে পেঁচিয়ে রয়েছে। চাকাটা অল্প অল্প ঘুরছে, ফলে রিকশাওয়ালার মুণ্ডুটাও অল্প অল্প ঘুরছে! সব মিলিয়ে সে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি।

যাই হোক, সকলের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে ব্যাপারটা আর বেশীদূর গড়ালো না, আমরা রেহাই পেলাম সে-যাত্রায়। তবে আমাদের বেশ কিছু জিনিসপত্রের লোকসান হয়ে গেল। আর এক-খানা রিকশা ভাড়া করে পচা ওর কাদামাখা দেহ নিয়ে চড়ে বসলো। রাগে ওর চোখমুখ লাল। 'পচা' নামের সঙ্গে ওর তৎকালীন অবস্থাটা অনেক-খানি মিলে গিয়েছিলো, সেইজন্যই বোধকরি পচা অত রেগে গিয়েছিলো!

অবশেষে ক্যাবলাদার পিসেমশায়ের বাগান-বাড়িতে গিয়ে পৌঁছুলাম আমরা।

সত্যিই চমৎকার সে বাড়ি, অদ্ভুত পরিবেশ। একটা মালী ছিলো। ক্যাবলাদাকে দেখে সে হাত-জোড় করে বাড়ির মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর মালপত্র ধরাধরি করে রিকশা থেকে নামাতে লাগলো।

খানিকক্ষণ জিরিয়ে আমরা রান্নাবান্নার তোড়-জোড় শুরু করে দিলুম। মালীটাও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগলো। কিন্তু লীডার ক্যাবলাদা বাগানে শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়তে লাগলো। মাঝে মাঝে বই পড়া বন্ধ করে ক্যাবলাদা আবার আমাদের তাড়াও দিতে লাগলো,—"কই রে, তোদের রান্না কদ্দূর? 'পেটে যে প্রায় ডজনখানেক ছুঁচো খোল-করতাল নিয়ে কীর্তন করছে!"

আমরা বললুম,—"এখন রান্নার অনেক দেরি। এই তো সবে শুরু হলো।"

ক্যাবলাদা এবারে কাঁদ কাঁদ স্বরে বললো,—"তাহলে অন্ততঃ কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা কর। কতক্ষণ কিছু না খেয়ে থাকবো?"

কি আর করা যায়! অগত্যা কিছু জল-খাবারের ব্যবস্থা আমাদের করতে হলো। খিদেও আমাদের সত্যিই খুব পেয়েছিল। রান্নাবান্না চুকতে চুকতে খুব বেলা হবে। ক্যাবলাদার প্রস্তাবটা মন্দ নয়।

—"এই যে দাদারা! কখন এলেন?" আমরা বেশ খোশমেজাজে খাবার খাচ্ছিলুম, হঠাৎ পিছনে সম্মিলিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি, জনা দশ-বারো মস্তান ছোকরা বাগানের গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করছে। বাগানের মধ্যে ঢুকে তারা বললো,—"কোথা থেকে আসছেন?"

আমরা গম্ভীর গলায় বললুম, "কলকাতা থেকে আসছি। পিকনিক করতে।"

—"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তবে দাদারা মনে রাখবেন যে, এ জায়গাটা কিন্তু কলকাতা নয়, চন্দনপুর।" ছোকরাদের মধ্যে একজন বেশ পালোয়ান গোছের ছেলে বললো।

—"তার মানে?" ক্যাবলাদার প্রশ্ন।

—"মানে খুবই সহজ। মানের বই না পড়েই বুঝতে পারবে।"

সেই পালোয়ান ছেলেটা বলে চললো,—"আমরা এখানকার বিখ্যাত মস্তান। আমাদের চন্দনপুরে যারাই পিকনিক করতে আসে, তাদের কাছ থেকে আমরা অর্ঘ্য পাই। আপনারা এসেছেন, সুতরাং আপনাদেরও পিকনিকের অর্ঘ্য আমাদের দিতে হবে। রাজী আছেন তো?"

ক্যাবলাদা এবারে আমতা আমতা করে বললো,—"কিন্তু ইয়ে, এত লোকের মতো খাবার তো আমাদের নেই। তবে দাঁড়াও, প্রসাদ…"

—"ওসব আমরা জানি না। আমরা ঠিক বেলা দুটোর সময়ে খেতে আসবো। খাবার না পেলে, একটাকেও জীবিত অবস্থায় কলকাতায় ফিরে যেতে দেবো না। এখন আমরা আড্ডা মারতে চললুম। যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। সেটা হলো, কেউ পালাবার চেষ্টা কোরো না। তাহলে কিন্তু হিতে বিপরীত হবে। এখন চলি।"

একনাগাড়ে এতগুলি কথা বলে মস্তান ছেলের দল চলে গেল। আর আমরা বেকুবের মতো বসে রইলুম। কারুর মুখে রা পর্যন্ত নেই।

* *

রান্নাবান্না চুকে গেল বেলা একটার মধ্যেই। সব রান্নাই মোটামুটি ভালোই হয়েছে। কেবল খিচুড়িটাই তেমন জুতসই হয়নি, অনেকটা জগা-খিচুড়ির মত হয়ে গেছে!

তবে ভাগ্য ভালো আমাদের। রান্নার সময়ে কোন অঘটন ঘটেনি। কিন্তু না ঘটলে কি হবে?. একটা অজানা আশঙ্কায় আমাদের বুকের ভেতরটা সে-সময়ে ধ্বক্‌ধ্বক্ করছিলো। মস্তানের দল আমাদের রীতিমত শাসিয়ে গেছে। বলে গেছে

—"এই যে দাদারা! কখন এলেন?" [পৃষ্ঠা ৫১৮

যে, তারা বেলা দুটোর সময় এসে আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে পিকনিক করবে।

সত্যিই তারা যদি এসে আমাদের সঙ্গে ভোজন করে, তবে আমাদের প্রেসটিজ একেবারে পাংচার হয়ে যাবে, সমাজে আর মুখ দেখানো যাবে না। ইতিমধ্যে ক্যাবলাদা আমাদের সুবুদ্ধি দিল। বললো,—"মানে মানে খেয়ে দেয়ে চম্পট দিই, কি বলিস তোরা?"

আমরা বললুম,—"নিশ্চয়। এত কষ্ট করে সব ব্যবস্থা করবার পর মস্তানের দল যদি এসে সব

সাবড়ে দেয়, তবে তা হবে আর লজ্জার কথা। আমাদের তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে এখান থেকে সরে পড়াই ভালো। ওদের আসতে এখনো ঘণ্টাখানেক দেরি আছে।"

মালীটা এতক্ষণ চোখ পিটপিট করে আমাদের কথাবার্তা সব শুনছিলো। এবারে সে বললো,—"না বাবুরা। অমন কাজ কখ্খনো করবেন না। স্টেশনের বাইরেই ওরা আড্ডা মারে। পালাতে গেলে ধরা আপনারা পড়বেনই।"

আমি বললুম,—"তাহলে উপায় ?"

ক্যাবলাদা সদর্পে বললো,—"কুছ পরোয়া নেহি। আসুক মস্তানের দল, আমি তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করবো। তোরা খেতে শুরু করে দে। পেট ভরে খাওয়া হয়ে গেলে ওরা তো আর খাবার-গুলো আমাদের পেট থেকে বার করতে পারবে না। অতএব লেট আস স্টার্ট।"

ক্যাবলাদার যুক্তিপূর্ণ পরামর্শ শুনে আমাদের মন খুশীতে ভরে উঠলো। উল্লাসে উল্লসিত হয়ে আমরা শালপাতা আর মাটির গ্লাস পাততে লেগে গেলুম ক্যাবলাদা সব কিছুর তদারক করতে লাগলো।

কিন্তু চন্দনপুরে মস্তানের দল ছাড়া ঠকবাজ ব্রাণ্ডেরও আবির্ভাব হয়েছে একথা যদি একটু আগে থাকতে জানতে পারতুম তাহলে মস্তানদের হাতে নিজেদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে অতিথি সৎকারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করিয়ে ফেলতুম।

যাক সে কথা।

পরামর্শমত ঠিক যখন খেতে বসতে যাব এমন সময়ে এক বাজখাঁই আওয়াজ শুনে চমকে উঠে পেছনে চেয়ে দেখলুম। দেখি আমাদের ঠিক পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছেন দশাসই চেহারার ভদ্রবেশী তিনজন লোক। তাদের একজন গুরু-গম্ভীর গলায় বলছেন,—"এই সেই ছেলের দল।"

তাঁদের সঙ্গে দু'জন পুলিস ইন্সপেক্টর ও প্রায় ডজনখানেক পুলিস !! ব্যাপার দেখে তো আমাদের চক্ষুস্থির। হাত-পা কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে।

—"কি ব্যাপার ?" লিডার ক্যাবলাদা সাহসে ভর করে আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে গেল।

—"চোপরাও।" একজন ভদ্রলোক একটা ধমক ছাড়লেন। সে ধমকের চোটে অমন জাঁদরেল লিডার ক্যাবলাদাও তিন হাত পিছিয়ে এলো।

একটু থেমে সেই বিশালবপু ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন বলতে শুরু করলেন,—"ইন্সপেক্টর সাহেব, এই বদমাশ ছোকরার দলকে এক্ষুণি গ্রেফতার করুন। এরাই আমার মা কালীর জন্য মানত করা পাঁঠাটাকে পিকনিকের জন্য চুরি করেছে !"

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ভদ্রলোক বলে উঠলেন,—"হ্যাঁ স্যার, এরাই। এদের আমি ঠিক চিনেছি। এরাই আমার দোকানের সমস্ত কয়লা চুরি করেছে !!"

এবারে তৃতীয় ভদ্রলোক বললেন,—"আমার যত বাসন ছিল, সব গত রাত্রে চুরি গেছে। এই হারামজাদারাই সে-সব বাসন চুরি করেছে !!! সমস্ত চোরাই মালের সাহায্যে এরা পিকনিক করছে। হতভাগা, শূয়োর।"

—"অ্যাঁ।" অভিযোগ শুনে আমাদের তখন চক্ষু চড়ক গাছ। চুল দিয়ে টপ টপ করে ঘাম ঝরছে !

"অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ।" একজন পুলিস ইন্সপেক্টর এগিয়ে এসে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে তিন চারজন পুলিস এসে আমাদের হাতে লোহার শিকল

পারিয়ে দিলে। তারপর অদূরে দণ্ডায়মান একটা পুলিসভ্যানের দিকে আমাদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো সেই ভদ্রলোক তিনজনের তখন কী আনন্দ! জয়ের হাসি ছড়িয়ে পড়ছে তাঁদের চোখে মুখে।

ঠিক ঐ সময়ে সেই মস্তানের দল এসে সেখানে হাজির হলো। আমাদের ঐ অবস্থায় দেখে তারা মনে মনে খুশীই হলো। আনন্দে আটখানা হয়ে তারা আমাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে নিজেরাই পিকনিক করতে লেগে গেল। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন ঐ তিনজন ভদ্রলোকও। আর আমরা পুলিসভ্যানের জানলা দিয়ে ঐ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে লাগলুম। দেখতে দেখতে ভ্যান আমাদের নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পেছনে পড়ে রইলো আমাদের শখের পিকনিক।

*　　*　　*

এর পরের ইতিহাস তোমাদের সংক্ষেপেই জানাচ্ছি। থানায় এসে আমাদের ওপর শুরু হলো পুলিসি অত্যাচার। আমাদের তখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' গোছের অবস্থা। আর শুধু কি অত্যাচার? মাঝে মাঝে দারোগাবাবুর হাড়-জ্বালানো মন্তব্য,—"আমি এ লাইনে আছি আজ তিরিশ বছর। তোমাদের মতো ফিচকে ছেলেদের শায়েস্তা করে আমার মাথার চুল পেকে গেছে। কাজেই তোমাদের কি করে টিট করতে হয়, তা আমি ভালোই জানি। তোমাদের একমাত্র ওষুধ হচ্ছে রামধোলাই।"

আমরা কাঁদ কাঁদ স্বরে বললুম,—"বিশ্বাস করুন স্যার, আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা কারুর কোন জিনিসই চুরি করিনি। আমরা কলকাতা থেকে এখানে পিকনিক করতে এসেছিলুম।"

কিন্তু থানার দারোগা আমাদের কথায় কর্ণপাতও করলেন না। 'চোর না শোনে ধর্মের

'ওয়াইট্' চিৎকার করে উঠলেন দারোগাবাবু। [পৃষ্ঠা

কাহিনী!' সুতরাং আমাদের ওপর অত্যাচার ক্রমশঃ বেড়েই চললো। পুলিসগুলো আশ মিটিয়ে হাতের সুখ করতে লাগলো আমাদের ওপর। অথচ বিশ্বাস কর, আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলাম। এটা ছিল একটা চক্রান্ত।

অবশেষে অনেক কাকুতিমিনতির পর দারোগাবাবু আমাদের মুক্তি দিলেন। কিন্তু একটা শর্তে। শর্তটা হলো, আমাদের প্রত্যেককে পাঁচ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে নচেৎ পাঁচ দিন থানায় আটকে থাকতে হবে। আমরা আর কি করি! অগত্যা জরিমানা দিতে রাজী হলাম আর রাজী না হয়েও কোন উপায় ছিলো না তবে

ভাগ্যি ভালো যে, পাঁচটা করে টাকা আমাদের সকলেরই পকেটে ছিলো।

কিন্তু গণ্ডগোল বাধালো ক্যাবলাদা। আমরা চারজনই পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী পাঁচটি করে টাকা দারোগাবাবুর হাতে দিয়ে থানা থেকে বেরোচ্ছিলাম, কিন্তু যেই ক্যাবলাদার টাকা দেবার পালা এলো, অমনি সে পকেট থেকে চার টাকা নিরানব্বুই পয়সা বার করে দারোগাবাবুর হাতে দিলো!

দারোগাবাবু বললেন,—"এর মানে?"

ক্যাবলাদা গম্ভীর গলায় বললো,—"মানে খুবই দুর্বোধ্য আমি দলের লিডার। এক পয়সা কম না দিলে আমার মর্যাদা থাকে না!"

—"ওয়াট?" চিৎকার করে উঠলেন দারোগাবাবু

ক্যাবলাদা বললো,—"কি?"

এবারে দারোগাবাবু দারুণ রেগে গেলেন। চিৎকার করে বললেন,—"রেডি?"

ক্যাবলাদাও আর কালবিলম্ব করলো না। দারোগাবাবুর মুখের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে "গো" বলে ছুটতে শুরু করলো। পেছন পেছন আমরাও।

ছুটতে ছুটতে আমরা পঞ্চ-পাণ্ডব যখন চন্দনপুর স্টেশনে এসে পৌঁছলাম, তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে। পেটে খিদের আগুন জ্বলছে, পকেটে একটা ফুটো পয়সাও নেই। ঠিক সেই সময় কলকাতা যাবার একটা ট্রেন হুড়মুড়িয়ে স্টেশনে ইন করলো। আমরাও আর কালবিলম্ব না করে ট্রেনে উঠে বসলুম।

একটু পরেই ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করলো। আমাদের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

কিন্তু আমাদের দুর্ভোগের আরও কিছু অবশিষ্ট ছিলো। কলকাতা ফেরবার সময় বিনা-টিকিটে ট্রাভল করবার জন্য আমরা পঞ্চ-পাণ্ডবই রেল পুলিসের হাতে ধরা পড়লাম। জি. আর. পি. আবার আমাদের সোজা হাওড়ার লক-আপে চালান দিলো। ক্যাবলাদার পরিচিত কর্তাব্যক্তিরা আমাদের চিনতেই পারলো না। এমনকি ক্যাবলাদাকেও না! ক্যাবলাদাকে সে-কথা বলতেই ও বললো,—"মানুষের দুর্দিনে কেউ তার পাশে এসে দাঁড়ায় না। সেই যে বইতে পড়িসনি, —সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায় হায় কেউ কারো নয়! মহাত্মা গান্ধী না পণ্ডিত জহরলাল কে যে কথাটা বলেছিলেন, তা ঠিক আমার মনে পড়ছে না!!"

দীর্ঘ ছয় দিন হাজত বাস. ও মুক্তির পর মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকা করে জরিমানা দেবার পর আমরা পঞ্চ-পাণ্ডব নিষ্কৃতি পেলুম। ১লা জানুয়ারী ১৯৭৫ তারিখে আমরা আবার পাড়া আলো করে ফিরে এলুম। আমাদের অভাবে পাড়াটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছিলো। বলা বাহুল্য, এর পর আর কোনদিনও পিকনিক করবার শখ আমাদের মাথায় আসেনি।

———

৫১৪ পৃষ্ঠার ১০নং প্রশ্নের উত্তর

বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সাজিয়ে দেখ।

শ্রীসুবীন্দ্রনাথ রাহা

(১২)

একই সময়ে দুই দিক থেকে চরেরা দুই রকম খবর আনছিল মন্ত্রী কশ্যপের কাছে। বিশ্বজিৎ-চিদাম্বরম্-ঘটিত খবরটারই কথা বলা হল এতক্ষণ, এইবার অন্য দিকেরও বৃত্তান্তটা বলি তাহলে। যেদিকে আছে বানরপত্তন, অর্থাৎ গরিলা অরণ্য।

বুঝতেই পেরেছেন পাঠিকা এবং পাঠকেরা যে, রাহুল চৌধুরীর কথাই আসছে এবারে, সেইসঙ্গে তার পড়ে-পাওয়া-বন্ধু তারিখ মোবারকের। তারিখ সাহেবের সত্যিকার পরিচয় অবশ্য চরেরা পায়নি গোড়ার দিকে। "ওদিক থেকেও দু'জন আসছে" —এইটুকুই বলছিল তারা। তা আসুক। দু'জন আসুক আর দু'শো জন আসুক, নওবাংয়ের তাতে কী? মুকুট যারা আনবে, তাদের নিয়েই যা কিছু কারবার কশ্যপের। তা এদের হাতে যে মুকুট নেই, এটা ধরে নেওয়া যায়। কত জনের কাছে থাকবে মুকুট? একদলের হদিস ত পাওয়াই গিয়েছে, যাদের দখলে আছে সেই পরম পদার্থ!

না, রাহুলদের নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার বোঝেননি কশ্যপ। হয়ত শিকারী, হয়ত পর্যটক, হয়ত ভাগ্যান্বেষী। যা-খুশী হোক, এ পর্যন্ত আসে যদি, পরিচয় পাওয়া যাবে তখন, আর সেই পরিচয় অনুযায়ী ব্যবহারই করা যাবে তাদের সঙ্গে।

দরকার বোঝেননি মাথা ঘামাবার, কিন্তু একদিন হল বুঝতে। যখন নাগোড়ার ঘটনা চরের মুখ থেকে শুনলেন কশ্যপ, তখন গুরু মহারাজের কাছে অবিলম্বে ছুটতে হল মন্ত্রীকে। "এ সেই ভূপাল তরফ্ফুর বংশধর, ডেঁপো ছেলেটা। তিন বছর আগে যাকে কড়া কথা বলে বিদায় দিতে হয়েছিল কোণার-সুবার্ণ থেকে।"

"কড়া কথা? আমরা কাউকে বলি নাকি কখনো?"—মৃদু হাসি গুরুর অধরকোণে ঝিলিক

দিয়ে গেল মুহূর্তের তরে—"ভাণ ভাণ একটা ভাণ করতে হয়েছিল কঠোরতার। ছোকরাকে তাড়িয়ে ঘরের বার করার দরকার ছিল। তা যেজন্য ওর যাওয়া প্রয়োজন হয়েছিল, তা ও করেছে হাঁসিল—"

গুরুর কথা হেঁয়ালির মত লাগছে মন্ত্রীর। যা তিনি কখনো করেন না, তাই আজ করে বসলেন। গুরুর সমুখে ধৈর্য হারালেন—"গুরুদেব, অবধান করুন। ঐ ছোকরা মোবারক নাগোড়া থেকে পাঁচশো জোয়ান নিয়ে ধেয়ে আসছে কোণার-সুবার্ণের দিকে। তারা রাজা বলে ঘোষণা করেছে এক বিদেশী যুবাকে, যদিও সে-যুবার দখলে কোন অর্ধমুকুট নেই।"

"চুরি গিয়ে থাকতে পারে"—গুরুর দু'চোখ যেন ধ্যানে বুজে আসতে চাইছে।

মন্ত্রীর এ-সময়ে আর গুরুকে উত্ত্যক্ত করা সমীচীন বোধ হল না। নিঃশব্দে তিনি চলে এলেন, দূর থেকেই প্রণাম নিবেদন করে।

এটা বিশ্বজিতের আগমনের আগের ঘটনা।

এখন বিশ্বজিৎ এসে গিয়েছে। তার আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়েছে রাজকীয় ঠাটেই। প্রাসাদে অবশ্য তাকে ঢোকানো হয়নি এখনো! অতিথিশালারই একাংশকে সাজিয়ে-গুজিয়ে এমন জমকালো আর মনোরম করে তোলা হয়েছে যে, দেখলেই তাকে রাজভবন বলে মনে হয়।

সবই বেশ সন্তোষজনক, কিন্তু বিশ্বজিৎ অস্থির হয়ে উঠেছে। অর্ধমুকুট তার কাছেই রয়ে গিয়েছে। কোণার-সুবার্ণে রক্ষিত অন্য অর্ধের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে পরিপূর্ণ একটাতে পরিণত করার দিকে চাড় নেই কারও। মন্ত্রীকে সেকথা কয়েকবারই বলেছে বিশ্বজিৎ। দু'জনের মধ্যে কথা যখন হয়, তখন হাস্যকর পরিস্থিতিই দাঁড়ায় একটা। শুদ্ধ বাংলাকে ভেঙে আধুনিক বাংলা করার উপায় খুঁজে খুঁজে নাজেহাল হন কশ্যপ। এদিকে আধুনিককে সংস্কৃত করার দুরূহ প্রয়াসে রীতিমত গলদঘর্ম হয়ে যায় বেচারী বিশ্বজিৎ।

কিন্তু যেকথা হচ্ছিল। কয়েকবারই বিশ্বজিৎ চাপ দিয়েছে মন্ত্রীকে—"অভিষেকের অনুষ্ঠানটা তাড়াতাড়ি কেন সেরে ফেলছেন না? জনসাধারণকে ডেকে আমার অর্ধমুকুটটা দেখিয়ে দেওয়া আর শশাঙ্ক-রাজবংশের যে শাখার বংশধর আমি, তার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তাদের শুনিয়ে দেওয়া, এইটাই ত এখন প্রথম কর্তব্য আমাদের।" রাজারূপে নিজের স্বীকৃতি আদায়টাই যে এই কর্তব্যসাধনের তাগিদ দিচ্ছে তাকে, সেটা নিজের মুখে সে আর প্রকাশ করেনি অবশ্য, কিন্তু বয়োবৃদ্ধ কশ্যপের কি আর তা বুঝতে বাকি থাকে? বুঝেও কিন্তু না-বোঝার ভাণ করছেন তিনি।

তাগিদ অবশ্য আরও আছে বিশ্বজিতের। সেটা হল চিদাম্বরম্ সম্পর্কে। "আমার পিছনে শত্রু আছে"—প্রথম দিন নাংজানবি পেরিয়ে এসে মন্ত্রিসভার কাছ থেকে সম্বর্ধনা নেবার সময়ই সে কানে কানে শুনিয়ে দিয়েছিল কশ্যপকে। তার ফলেই সঙ্গে সঙ্গে ওপারে লোক পাঠিয়ে কশ্যপ বেঁধে আনেন চিদাম্বরম্‌কে। আটক করেন তাকে কেল্লার বন্দীগৃহে। সেইখানেই সে আছে। অভিষেকপর্ব মিটে না গেলে সে বন্দীর বিচার নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কোন ইচ্ছেই নেই কশ্যপের।

"বিচার হোক ওর তাড়াতাড়ি"—একথা জোর করে বলতে পারছে না বিশ্বজিৎও। বিচার যাকে বলে, সে-জিনিস এড়িয়েই চলতে চায় ও। নইলে ভিতরের কথা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। শত্রু বলে যাকে দেখিয়ে দিয়েছে বিশ্বজিৎ, সে যে শত্রু নয় আসলে, উলটে চৌর্যবৃত্তির সহকারী, একথা ত কোনমতেই বিশ্বজিৎ প্রকাশ পেতে

দিতে পারে না। কাজেই বিচার-টিচার নয়। আগে অভিষেকটা হয়ে যাক, রাজক্ষমতা হাতে আসুক, তখন বিনা বিচারেই বিশ্বজিৎ এমন ব্যবস্থা করবে চিদাম্বরমের—

যে ব্যবস্থা তার মাথায় আছে, তা দ্বিতীয় ব্যক্তি কারও কাছে প্রকাশ করার মত নয়। যারই কাছে বলা যাবে, সে শিউরে উঠবে ভয়ে ঘৃণায়। থাকুক, বিশ্বজিতের মনের গোপন কোণেই আবদ্ধ থাকুক তা।

তাই বন্দীর কথা একবারও কশ্যপের কাছে তোলে না বিশ্বজিৎ, তাগাদা দেয় অভিষেকটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলবার জন্য। মন্ত্রী এক বাঁধা জবাব দিয়ে যাচ্ছেন সে তাগাদার—"গুরু এখন ধ্যানস্থ তাঁর ধ্যানভঙ্গ না হলে ত কিছুই হবার উপায় নেই! তাঁর নির্দেশ না নিয়ে এ-রাজ্যে কখনো কিছু হয় না।"

বিশ্বজিৎ মনে মনে অভিশাপ দেয় গুরুকে। একান্তই মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা। এই বিংশ শতাব্দীতেও রাষ্ট্র-কাঠামোর ভিতরে গুরু-নামক জীবের কোনও স্থান থাকতে পারে, এ তার ধারণার ভিতরে ছিল না।

কিন্তু উপায় নেই। ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া উপায় নেই।

বাধ্য হয়েই সে ধৈর্য ধারণ করে আছে। নগর ওদিকে সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে তৎপর হয়ে উঠল। সৈন্যসজ্জা শুরু হয়েছে কোণার-সুবার্ণে। "কী? কী? ব্যাপার কী?"—বিশ্বজিতের উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তরে কশ্যপ একদিন জানালেন—"নাগোড়া জনপদের অধিবাসীরা অভিযান চালিয়েছে নওবাংয়ের বিরুদ্ধে। আশ্চর্যের কথা, তাদের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত আছেন যিনি, তিনিও গৌড়বঙ্গ থেকে সদ্য-সমাগত মুকুট তাঁর হাতে না থাকলেও,

—"এ-ধ্যান কবে ভাঙ্গবে বলতে পারেন?" [পৃষ্ঠা ৫২৬

তিনি নাকি দাবি করছেন—নওবাং রাজ্যের সত্যিকার অধিকারী তিনিই।"

"কী করে? কী করে?"—সারা মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলেও বিশ্বজিৎ প্রশ্ন করল জোর গলায়—"মুকুট দেখাতে না পারলে—?"

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই কশ্যপ বললেন—"ইনি ত বলছেন, মুকুট তাঁর তরফ থেকে গচ্ছিত ছিল এক জায়গায়, সেইখান থেকে তা চুরি গিয়েছে।"

এক মুহূর্ত নীরব থেকে বোধহয় বিশ্বজিতের মুখের রক্তশূন্যতাই লক্ষ্য করলেন মন্ত্রী, তারপর

মৃদুস্বরে যোগ করলেন আরও কয়েকটি কথা—"এ অবশ্য সেই নাগোড়া নেতারই উক্তি। এর সত্য-মিথ্যা আমরা কিছুই জানি নে।"

"তা—তাকে আপনারা বলেছেন কী? কিছু একটা বলেছেন ত?"—অধীর প্রশ্ন বিশ্বজিতের। তার বুকের ভিতরটা যেন ধুকধুক করছে ভয়ে। তীরে এসে নৌকা ডুবল বুঝি তার।

"কী আর বলব? আপনাকেও যা বলেছি, বলে পাঠিয়েছি তাঁকেও তাই। বলেছি—গুরু এখন ধ্যানস্থ। ধ্যান না ভাঙ্গলে—"

এবার আর ধৈর্য রক্ষা করতে পারল না বিশ্বজিৎ। ক্রুদ্ধকণ্ঠেই বলে উঠল—"এ-ধ্যান কবে ভাঙ্গবে বলতে পারেন?"

এক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে রইলেন মন্ত্রী, রাজপদের দাবিদারের মুখের দিকে। তারপর শান্তস্বরেই উত্তর দিলেন—"তা পারি বলতে। গুরু ধ্যানে বসবার আগে নিজেই বলেছিলেন আমাকে। বলেছিলেন যে, তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হবে সেইদিন যেদিন নাওবাংয়ের আকাশে দেখা দেবে পুষ্পকরথ।"

পুষ্পক রথ? মন্ত্রী বুড়োটা কি পরিহাস করছে নাকি বিশ্বজিৎকে? অতি কষ্টে সে আত্মসংযম বজায় রাখছে। কিন্তু আর বুঝি সে পারে না। মানে কী এ-সবের? তুলোট কাগজের লিখন আছে—দুই অর্ধমুকুট মিলিত হয়ে এক ভাগ্যবানের মস্তকে শোভা পাবে একদিন। এক অর্ধমুকুট তেরো শো বছর ধরে পড়ে আছে এখানে। বাকী অর্ধটা এনেছে এই বিশ্বজিৎ রায়। অন্য কারও কোন দাবি চলবে না এখানে। চলবে না কোনমতে। চলবেই না যখন, এসব বাহানার মানে তা হলে কী? গুরুর ধ্যান? পুষ্পক রথ? হাঃ হাঃ হাঃ—পুষ্পক মানে যদি প্লেন হয়, পাণ্ডববর্জিত এই নাওবাংয়েও তার আবির্ভাব সম্ভব হলেও হতে পারে বা। কিন্তু ধ্যান? এই বিংশ শতাব্দীতেও ধ্যান-নামক বুজরুকিতে কেউ বিশ্বাস করে নাকি?

বিশ্বজিৎ এদিকে নিজের ঘরে বসে তড়পাতে থাকুক। রাহুল চৌধুরীর মনে ওদিকে তিলমাত্র ব্যস্ততা নেই। তার ছাউনি পড়েছে পিরামিড পাহাড়ের পিছনে এক মনোহর উপত্যকায়। আর অগ্রসর না-হবার অনুরোধ মন্ত্রী কশ্যপই তার কাছে পাঠিয়েছিলেন—"গুরু এখন ধ্যানস্থ। সব বিতর্কের মীমাংসা শান্তির পথে হওয়াই কি বাঞ্ছনীয় নয়? নাওবাংয়ের কোন গুরু কোন যুগে কারও উপরে অন্যায় করেছেন, ইতিহাস একথা বলে না।"

"এ-ধ্যান কোন্ পর্যন্ত ভঙ্গ হতে পারে?"—প্রশ্ন করেছিল রাহুল। উত্তর পেয়েছিল—"নাওবাংয়ের আকাশে যেদিন পুষ্পকের আবির্ভাব হবে, সেইদিনই দর্শন পাবেন গুরুর।"

রাহুল কি দূতের সঙ্গে পরিহাস করল একটু? "মাটিতে ঢের রথ দেখেছি আপনাদের। কোনটা দুই ঘোড়ায় টানছে, কোনটা চার ঘোড়ায়। আট ঘোড়ার রথও একখানা আছে, শুনেছি তারিখ মোবারকের কাছে।"

বাধা দিয়ে দূত বলল—"আছে, আছে। হয়ত আপনিই একদিন চড়বেন সে-রথে। আট ঘোড়ার রথও একখানা আছে, তাতে চড়েন একমাত্র রাজা।"

"ওঃ, তাই বুঝি?"—বলল রাহুল—"কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য ছিল। আপনাদের পুষ্পকও ঘোড়ায় টানে কিনা। আকাশে ওড়ার পক্ষে ঘোড়ারও ত কোন অসুবিধা হবার কথা নয়, যদি নাকি সে ঘোড়ার ডানা থাকে।"

বিশ্বজিৎ জানে না। জানলে হয়ত রাগে হাত কামড়াত নিজের। রাহুলকে যে রকম রাজভোগে রেখেছেন কশ্যপ, তা বিশ্বজিতের পক্ষেও ঈর্ষার

বস্তু হতে পারত। নাওবাংয়ের আতিথ্যে রাহুল চর্ব চোষ্য খাচ্ছে চারবেলা, আর রাইফেল চালানো শেখাচ্ছে তার নাগোড়াবাসী সৈনিকদের। মোটে দু'টোই অবশ্য আছে রাইফেল, কিন্তু রাজপদে অভিষিক্ত হতে পারলেই সে আদ্দিস-আবাবা থেকে অন্ততঃ দু'-হাজার রাইফেল দুই এক মাসের মধ্যেই আনিয়ে ফেলবে।

কে হবে তাহলে অভিষিক্ত? রাহুল, না বিশ্বজিৎ? জানেন তা একমাত্র গুরু মহানন্দ ভারতী। তা তিনিও আপাততঃ ধ্যানস্থ। ধ্যান তাঁর ভাঙ্গবে, যেদিন পুষ্পক রথ—

পুষ্পক? না, আকাশপথে নাওবাংয়ের দিকে যে জিনিসটা বায়ুবেগে এগিয়ে আসছে, তার সঙ্গে পুরাণে রামায়ণে মহাভারতে বর্ণিত পুষ্পক রথের বিশেষ সাদৃশ্য নেই। তবে কথা এই পুষ্পক সম্পর্কে মহানন্দ ভারতীরও ধারণা হয়ত খুব সুস্পষ্ট না হতে পারে। আকাশচর যে কোন যানকেই হয়ত পুষ্পক-নামে অভিহিত করে থাকেন গুরুজী। তা যদি হয়, তবে নাওবাংয়ের আকাশে দ্রুত এগিয়ে আসছে ঐ যে একখানা বিমান—ওটিও ত পুষ্পক একটি।

আসলে হেলিকপ্টার। আবিসীনিয় সরকার ধার দিয়েছেন ভারতের রাষ্ট্রদূত মাননীয় সুব্বারাওকে। আছেন, সুব্বারাও নিজেই আছেন হেলিকপ্টারে। আর আছেন—

তিনজন আছেন সুব্বারাও ছাড়াও। নাওবাং গুরুর মুখ্য শিষ্য অচ্যুতানন্দ ভারতী, ইতালীয় ডাক্তার এলরিকো এবং কলকাতার চটকল মালিক জেসিডির ভাগিনেয় শতানীক সেন।

শতানীক যখন হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে অ্যালায়ান্স হোটেলে শুয়ে বসে হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছিল, তখন একদিন এনরিকোর মাধ্যমে তার পরিচয় ঘটে এমন এক তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে, যিনি কথা বলেন কেতাবী বঙ্গ ভাষায়, যিনি আধুনিক ব্যবহারিক জ্ঞান আয়ত্ত করবার জন্য যাত্রা করেছিলেন ইউরোপে। কিন্তু আদ্দিস-আবাবাতে পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিপ্যাথি-সূত্রে যিনি সুদূর নাওবাং থেকে গুরুর আদেশ পেয়েছিলেন একটা অপহৃত মুকুটের রহস্য উদ্‌ঘাটন কল্পে সচেষ্ট হওয়ার জন্য। এনরিকোর আছে হিন্দুযোগ সম্পর্কে অসীম কৌতূহল এবং গভীর শ্রদ্ধা। তাই অচ্যুতানন্দকে নিয়ে তিনি মাতামাতি করলেন যথেষ্ট, শতানীকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন তাঁর। অচ্যুতানন্দ জানলেন যে, সেই অপহৃত মুকুটখানা শতানীকেরই বন্ধুর সম্পত্তি। চুরি গিয়েছে সুব্বারাওয়ের হেফাজৎ থেকে তাঁরই কর্মচারী চিদাম্বরমের বিশ্বাসঘাতকতায়।

তারপর শুরু হল ঘটনাচক্রের দ্রুত আবর্তন। এনরিকো অচ্যুতানন্দ সহ শতানীকের অভিযান সুব্বারাওয়ের দূতাবাসে। সুব্বারাওয়ের পক্ষ থেকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস। অপহৃত মুকুটের ইতিহাস আগে তিনি বিশেষ কিছু জানতেন না, এখন সব খুলে বললেন তাঁকে। এদিকে শতানীক, ওদিকে অচ্যুতানন্দ।

অতঃপর? চাই এক্ষুণি ওদের পশ্চাদ্ধাবন। পথ মোটামুটি জানা ছিল শতানীকের, অষ্টাশী বাহান্ন। এখন সুবিধা হয়েছে, সঙ্গে থাকা অচ্যুতানন্দও। সুব্বারাও টেলিগ্রাফে অনুমতি নিলেন ভারত সরকারের। এ ব্যাপারে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের হস্তক্ষেপ অনুমোদন না করে পারলেন না তাঁরা, অপহৃত মুকুটার্ধ যখন এক ভারতীয় রাজবংশের প্রাচীন সম্পদ।

আবিসীনিয় সরকারকে অনুরোধ করা মাত্র তাঁরা একখানা হেলিকেপ্টার ধার দিয়ে দিলেন সুব্বারাওকে সেই বিমানই আজ অবতরণ করল

সেখান থেকে তা অপহরণ করে ঐ বিশ্বজিতের প্ররোচনায়···

কোণার-সুবার্ণ থেকে দুই কিলোমিটার দূরের এক প্রান্তরে, নাংজানবি নদীর ধারে। দুই দণ্ডের ভিতরই কয়েকখানা রথ এসে গেল শহর থেকে। তাতে বিমানের আরোহীদের জন্য এসেছে খাদ্য নীয় এবং অন্য যাবতীয় দরকারী জিনিস। সেই থেই অচ্যুতানন্দ চলে গেলেন গুরুচরণ দর্শনের জন্য

গুরুর ধ্যানভঙ্গ হয়েছে

নগর চত্বরে মহতী জনসভার অধিবেশন ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী কশ্যপ। নাগরিকেরা সমবেত হয়েছে হাজারে হাজারে, আসন গ্রহণ করেছে সুশৃঙ্খলভাবে সভাস্থলের এক পাশে উঁচু বেদী, যার উপরে স্বর্ণাসনের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মন্ত্রী অন্য পাশে বিশ্বজিৎ। দুইজনেরই মুখ জনতার দিকে ফেরানো।

বিশ্বজিতের চোখ বনবন করে ঘুরছে সভাময়। রাহুলকে খুঁজছে সে-চোখ! নাঃ, রাহুলকে কোথাও যায় না দেখা। বুকের ধুকধুকুনি ক্রমে কমে আসে তার। মন্ত্রীর অনুরোধে সে এবার তার বক্তব্য বলতে শুরু করল। তার বক্তব্য, সে-ই মহারাজ মানবাদিত্যের সাক্ষাৎ বংশধর, তারই বংশে অর্ধমুকুট গোপনে রক্ষিত হয়েছে তেরো শো বছর ধরে। ভবিষ্যদ্বাণী ছিল ত্রিকালদর্শী গুরু কৃষ্ণভারতীর যে তেরো শো বছর অন্তে···ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপসংহারে সে বসনাবৃত অর্ধমুকুট বার করল জামার ভিতর থেকে। আবরণ উন্মোচন করে সেটিকে রক্ষা করল স্বর্ণাসনের উপরে। সেই মুহূর্তে মন্ত্রীও সেই অর্ধমুকুটের পাশে স্থাপন করলেন অন্য একখানি অর্ধমুকুট। এটি সেই অর্ধেক, যা তেরো শো বছর ধরে অবস্থান করেছে শঙ্করাদিত্যের বংশে। জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ল দুই অর্ধকে পাশাপাশি দেখে।

"এইবার জোড়া দেওয়া হোক দুই আধখানাকে, পুরো মুকুট পরানো হোক শশাঙ্ক-মহারাজের একমাত্র জীবিত বংশধরকে।"—উঠল কোলাহল।

"সে বংশধর আমি"—সভাস্থানের একেবারে পিছন দিক থেকে উঠল এক সমুচ্চ দাবি।

জনতা চমৎকৃত হয়ে পিছন ফিরে দেখল—এক গৌরকান্তি শালপ্রাংশু যুবা এগিয়ে আসছে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে—"ঐ অর্ধমুকুট ছিল আমাদের বংশে, ঐ বিশ্বজিৎ ওরফে সঞ্জয়ের বংশে নয়। আমার বন্ধু শতানীক ওটা গচ্ছিত রাখেন রাষ্ট্রদূত সুব্বারাওয়ের কাছে। সেখান থেকে তা অপহরণ করে, ঐ বিশ্বজিতের প্ররোচনায়, চিদাম্বরম্ আপ্পে—

"মিথ্যা কথা"—হুঙ্কার করে উঠল বিশ্বজিৎ। সে ভাঙ্গবে, তবু মচকাবে না। মরিয়া, বেপরোয়া সে এখন। মিথ্যাকেই গায়ের জোরে সে সত্য বলে জাহির করবে। "মিথ্যা কথা"—তাই তার অলজ্জ দম্ভোক্তি।

"মিথ্যা কথা?"—বিশ্বজিতের ঠিক পিছন থেকেই বলে উঠল শৃঙ্খলিত চিদাম্বরম্—"আমিই চুরি করে এনে তোমায় দিয়েছিলাম ঐ মুকুট! আমি, যার সঙ্গে তুমি ভদ্রলোকের চুক্তি করেছিলে একটা—"

"মিথ্যা কথা?"—রাহুলের পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল তারিখ মোবারক—"বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে তুমিই না হত্যা করতে গিয়েছিলে রাহুল চৌধুরী আর শতানীক সেনকে? আমি দরোজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকতেই তুমি পালালে। আর পালাবার মুখে তুমিই না হত্যা করলে রাস মোজাফ্‌ফারকে?"

"রাস মোজাফ্‌ফারের হত্যা!"—বলে উঠলেন সুব্বারাও—"ষড়যন্ত্র আর প্রতারণার দায় থেকে নাওবাং সরকার যদি তোমায় অল্পে অল্পে রেহাই দেনও, আবিসীনিয়ার সরকার তোমায় ফাঁসি দেবেই মোজাফ্‌ফারের হত্যার দরুন। ভারতের মুখে কলঙ্ক লেপন করলে তুমি—"

"অনীকদা! অনীকদা!"—বলে রাহুল তখন সবে ছুটে এসে সুব্বারাওয়ের পাশে দাঁড়ানো শতানীককে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করেছে, এমন সময়ে দুম করে একটা পিস্তলের আওয়াজ। বিশ্বজিৎ নিজের মাথা নিজেই উড়িয়ে দিয়েছে গুলি করে।

শতানীক একটা নিশ্বাস ফেলে বলল—"পাপের পুরস্কার মৃত্যু। মন্ত্রি, এইবার তাহলে গুরুদেবের নির্দেশ নিয়ে আসুন, কবে অভিষেক হবে মহারাজ রাহুলাদিত্যের?"

মন্ত্রী কশ্যপ বললেন—"গুরুর নির্দেশ ত কৃষ্ণ-ভারতীর আমল থেকেই রয়েছে। নিকটতম শুভদিনেই হবে অভিষেক। ওকথা নিয়ে আর গুরু মহানন্দ ভারতীকে ত্যক্ত করার দরকার নেই। তিনি বোধহয় এতক্ষণে আবার ধ্যানস্থ।"

—শেষ—

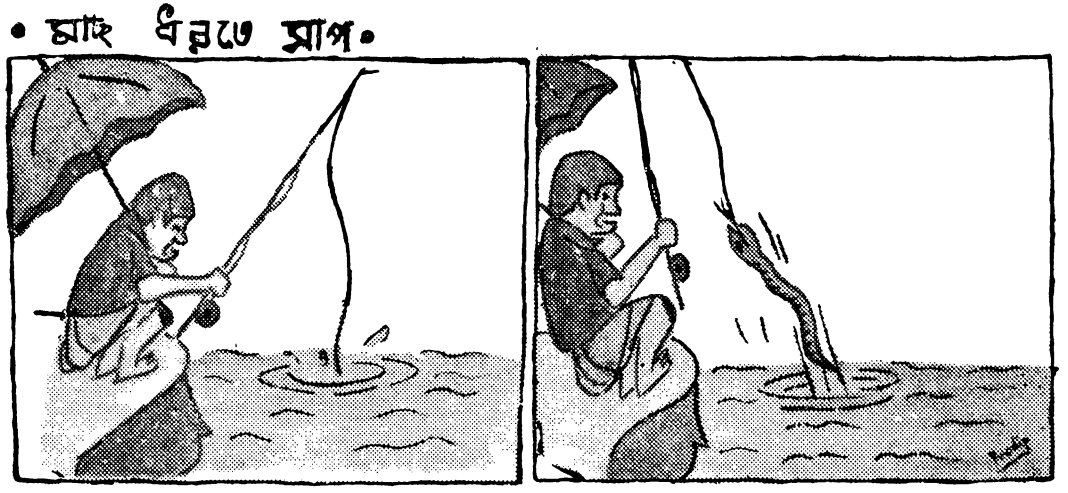

তরুণীটি উদ্ভ্রান্তের মত দরজাতে ধাক্কা দিতে লাগল
দড়াম
কে আছেন ? দরজা খুলুন, দরজা খুলুন!
দরজা নিঃশব্দে ফাঁক হয়ে গেল
ভেতরে কি অন্ধকার!
ভেতরে আসুন! টর্চ জ্বালবেন না! যা আনতে লিখেছিলাম, এনেছেন?
কি সর্বনাশ! কার গলার স্বর! এত অন্ধকারে ভেতরে ঢুকব কি করে?
হ্যাঁ, যা লিখেছিলেন, এনেছি!
ভিতরে ঢুকতেই সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল পিছনের দরজা। দপ্ করে জ্বলে উঠল ঘরের আলো!
আঃ! এ কে!
আমিই তোমাকে চিঠি দিয়েছিলাম রত্না! আমাকেই লোকেরা ব্ল্যাক প্যান্থার নামে ডাকে। আমাদের পরিচয় হল কি বল ?
3

কি সর্বনাশ! পেছনের দরজা বন্ধ!
পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে সুন্দরী! ও দরজা আর এ জীবনে খুলবে না!
এসবের মানে কি! রঞ্জন কোথায়?
রঞ্জনের কাছেই তোমাকে পাঠাচ্ছি সুন্দরী!
ল্যাংড়া! ল্যাংড়া!
একি!
ল্যাংড়া, এ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। একে নিয়ে যা। দেখিস যেন এর কষ্ট না হয়!
একি! এতো সেই লোক! না, আমি যাব না!
হিঃ হিঃ মেয়েটাকে রঞ্জনের কাছে নিয়ে যাব ব্ল্যাক প্যান্থার?

(ক্রমশঃ)

বাঁশী বনাম বীণ

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

লেখক-পরিচিতি ঃ—

গটফ্রিড ফন স্ট্র্যাসবার্গ-এর জন্মস্থান বা জন্মকাল কোনটাই ঠিক ঠিক জানা নেই কারও। তবে তিনি যে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের লোক, তাঁর মৃত্যু যে ঘটেছিল আনুমানিক ১২১০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে, এটুকু একরকম নিঃসন্দেহেই বলা চলে। গটফ্রিড ছিলেন হাটম্যান ফন উয়ে এবং উলফ্রাম ফন এসেনবাকের মত চারণ কবি। প্রধানতঃ নাইটগণের বীর কীর্তি ও প্রেম-কাহিনী নিয়ে গাথা ও কবিতা রচনা ছিল এঁদের কাজ। প্রসিদ্ধ নাইট স্যার ট্রিস্টানকে কেন্দ্র করে সারা ইউরোপে নানা ভাষায় নানা কাহিনী রচিত হয়েছিল। গটফ্রিডের এই কাহিনীটি মিসেস জেসি ওয়েস্টন কর্তৃক অনূদিত হয় ইংরেজীতে "দ্য কামিং অব গ্যাণ্ডিন" নাম দিয়ে। বর্তমান গল্পটি তারই অনুবাদ।

●

কর্ণওয়ালের এক বন্দরে এসে ভিড়ল আয়ারল্যাণ্ডের একখানি জাহাজ। এক তরুণ নাইট নামলেন তা থেকে। গ্যাণ্ডিন এঁর নাম। আইরিশ অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ইনি। ধনবান, সুদর্শন, সদালাপী। তা ছাড়া এঁর শৌর্যবীর্যের খ্যাতিও বিলক্ষণ আছে আয়ারল্যাণ্ডে।

গ্যাণ্ডিনের পরিধানে মহার্ঘ অসামরিক পরিচ্ছদ, অসি-ভল্ল বা অন্য কোন অস্ত্রই তাঁর সঙ্গে নেই আজ। অস্ত্রের বদলে পিঠে ঝোলানো আছে একটি বাঁশী।

জাহাজ-ঘাটা থেকে রাজা মার্ক-এর প্রাসাদ খুব বেশী দূরে নয়। গ্যাণ্ডেন ধীরে ধীরে ঘোড়া চালিয়েও অতি অল্পক্ষণেই সেখানে পৌঁছে গেলেন। রাজা রানী তখন সভাগৃহেই রয়েছেন। গ্যাণ্ডিন গিয়ে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করলেন রাজাকে ও রানীকে। রানীর নাম ইসুল্ট। ইনিও আয়ারল্যাণ্ডেরই মেয়ে। মাতৃভূমিতে থাকতে গ্যাণ্ডিনের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল এঁর।

দেখামাত্রই ইসুল্ট চিনলেন গ্যাণ্ডিনকে। বিশেষ সমাদরেই গ্রহণ করলেন তাঁকে—"স্বাগত স্যার গ্যাণ্ডিন! কোথা থেকে এলেন?"

"এই ঘুরতে ঘুরতে। সমুদ্রে সমুদ্রে টহল দিয়ে বেড়ানো আমার নেশা। এই বন্দরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ইচ্ছে হল একবার আপনাকে দেখে যাই। আয়ারল্যাণ্ডে থাকতে আপনার সৌন্দর্য আর স্বভাব-মাধুর্যই ত বীরকর্মে প্রেরণা যোগাত আমার মত নবীন নাইটদের।"

রানী ইসুল্ট স্বামীর কাছে পরিচয় দিলেন গ্যাণ্ডিনের। রাজাও স্বাগত জানালেন অতিথিকে। কিন্তু দেশ-বিশ্রুত নাইট হয়েও গ্যাণ্ডিন অস্ত্রত্যাগ করে পর্যটনে বেরিয়েছেন কেন, বিশেষ করে একটা বাঁশী পিঠে বেঁধে, সে-সম্পর্কে আকারে ইঙ্গিতে কৌতূহল প্রকাশ করতেও তাঁর দ্বিধা দেখা গেল না।

কিন্তু সে-কৌতূহলের নিবৃত্তি যাতে হতে পারে, এমন কোন জবাব যখন গ্যাণ্ডিনের মুখ থেকে কিছুতেই বেরুল না, তখন রাজা ওকথা নিয়ে অতিথিকে আর বিরক্ত করা উচিত মনে করলেন না। রানীর পূর্ব-পরিচিত, স্বদেশীয় এবং বন্ধু-স্থানীয় যখন, তখন যে-বেশেই আসুন, এ-ভদ্রলোক সমাদরের যোগ্য অবশ্যই। সমাদর করলেনও রাজা। নিজের কাছে এনে বসালেন গ্যাণ্ডিনকে,

তাঁরই দেশের নানা কথা নিয়ে আলাপ শুরু করলেন, অন্য সব কাজ ত্যাগ করে।

রাজা রানীর ভোজনের সময় এসে গিয়েছিল, দেশাচার-মতে রাজা রানী সভাগৃহেই ভোজন করে থাকেন দিনের বেলায়। সমবেত সভাসদেরাও আহার করেন রাজার সঙ্গেই। আজ গ্যাণ্ডিনকেও সেই ভোজে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করা হল, এবং যেহেতু গ্যাণ্ডিনের পিঠে বাঁশী রয়েছে একটি, সেই কারণেই সভাসদেরা তাঁকে অনুরোধ করতে লাগলেন দুই একটা সুর সেই বাঁশীতে তুলবার জন্য। খাওয়ার সময় গান-বাজনার রেওয়াজ ত আছেই দেশে!

অনুরোধ যা কিছু তা সভাসদদের দিক থেকেই আসছে, রাজা রানী দু'জনেই নীরব ও-সম্পর্কে।

আজেবাজে লোকদের অনুরোধ অতিথি ইচ্ছে করলে উপেক্ষাও করতে পারেন, কিন্তু রাজা রানীর অনুরোধ ত অনুরোধ নয়, সেটা দস্তুরমত আদেশই। গ্যাণ্ডিনের যদি আন্তরিক অনিচ্ছা থাকে এসময়ে বাঁশী বাজাতে, সে আদেশ তাঁর কাছে পীড়ন বলেই প্রতীয়মান হবে। জেনে শুনে অতিথিকে পীড়ন করতে আছে কি? ছিঃ!

সভাসদেরা কিন্তু উপেক্ষিত হয়ে রেগে যাচ্ছে। অনুচ্চস্বরে টিটকারি দিতে শুরু করেছে গ্যাণ্ডিনকে —"অসির বদলে বাঁশী ধরেছ কেন হে নাইট?" "বিরাগী হয়ে কোথায় চলেছ বীরপুরুষ?"— ইত্যাকার সব বাণী আর কি! গ্যাণ্ডিনের কানে কি আর যাচ্ছে না সে সব? কিন্তু তাঁর বিচলিত হবার কোন লক্ষণ নেই তাতে। নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি ওড়ায় হাসে—এমনি-ধারা মনোভাব নিয়ে আপন মনে সমুখের উপাদেয় খাদ্য পানীয়গুলির সদ্ব্যবহার করে যাচ্ছেন।

অবশেষে ভোজ সমাপ্ত হল। তখন গ্যাণ্ডিন রাজার দিকে তাকিয়ে বললেন—"মহারাজ, অবধান করুন। এই মাননীয় ভদ্রলোকেরা আমার বাঁশী শুনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমার ওস্তাদের একটি আদেশ আছে আমার উপরে। সেটি হল এই—'উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পেলে কখনো কাউকে বাঁশী শোনাবে না। নিজের ইচ্ছায় বাজাও যদি, সে উত্তম কথা। কিন্তু অপরের চিত্তবিনোদনের জন্য বাজাতে হলে মেহনতের মূল্য নেবে। না নিলে সেই দণ্ডেই তোমার সব শিক্ষা নিস্ফলা হয়ে যাবে।"

কথা শুনে রাজা ত অবাক্। গ্যাণ্ডিনের মত নাইটের মুখে এমন উক্তি? তারপরই নিজের সংশয়ের জবাব নিজের মন থেকেই বার করলেন একটা। গুরুর আদেশ যদি হয়, শিষ্য অন্যথাচরণ করবে কেমন করে? সত্যিসত্যিই বহু সাধনায় অর্জিত বিদ্যাটুকু নিস্ফলা হয়ে যেতে পারে ত। গুরুদের খেয়ালও থাকে নানারকম, আবার তাঁদের অভিশাপের পরিণামও হতে পারে সাংঘাতিক। তাই গ্যাণ্ডিনের উক্তি শুনে সভাসদেরা সবাই তাঁর উপরে বিরক্ত হয়ে উঠল যদিও, রাজা কিন্তু হাসিমুখেই উত্তর করলেন—"এ আর এমন কী শক্ত কথা? গুরুর আদেশ থাকলে ত কথাই নেই। সেরকম আদেশ ব্যতিরেকেও ত কলাবিৎ গুণীরা পারিশ্রমিক পেতে পারেন ও নিয়ে থাকেন। আপনিও পাবেন পারিশ্রমিক। আমার সভাসদ বন্ধুদের তৃপ্তিবিধান যদি করেন আপনি, আমি অবশ্যই আপনার মনোমত পারিশ্রমিক দেব আপনাকে!"

"দেবেন? অসাধারণ কিছু যদি প্রার্থনা করি আমি, তাও দেবেন ত? দেখুন বিবেচনা করে।" —গ্যাণ্ডিনের মুখে কৌতুকের হাসি।

রাজা ঠিক এরকম বাক্যালাপ শুনতে অভ্যস্ত নন। তিনি একটু বিরক্তির সুরেই উত্তর দিলেন —"আমি রাজা, রাজার কথার খেলাপ হয় না।

পিঠ থেকে বাঁশী হাতে এনে প্রথমে মাথায় ছোঁয়ালেন গ্যাণ্ডিন

যত অসাধারণই হোক, আপনার প্রার্থনা আমি পূরণ করব।"

"তবে আর কী!" এই বলে পিঠ থেকে বাঁশী হাতে এনে তাকে প্রথমে মাথায়, তারপরে বুকে ছোঁয়ালেন গ্যাণ্ডিন। চোখ বুজে বসে ধ্যান করলেন খানিকক্ষণ, বুঝি-বা গুরুবন্দনাই করে নিলেন মনে মনে। সভাসদেরা সে-সব দেখে এ-ওর পানে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে, যে হাসির অর্থ—"কত ভড়ংই জানে এই বাঁশীওয়ালা নাইট!"

কিন্তু তাদের হাসি-ঠাট্টা সব নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল দেখতে দেখতে। বাঁশীতে ফুঁ দিয়েছেন গ্যাণ্ডিন। নিশীথ রাতে নাইটিঙ্গেল যেন ডেকে উঠল উপবননিকুঞ্জে। যারা বিদ্রূপ করছিল, তারা মুগ্ধ বিস্ময়ে মৌন হয়ে রইল। বাঁশীতে সপ্তস্বর খেলতে থাকল ঝলমল সূর্যালোকে সাবলীল তরোয়ালের মত। এই সে বাঁশীতে বেজে উঠল গুরুগুরু মেঘের ভমরু, এই আবার তার রন্ধ্র থেকে ঝরে পড়তে লাগল ঝরঝর বর্ষণের করুণ স্নিগ্ধ কোমল রাগিণী। কখনো দীপ্ত, কখনো বিগলিত করে দিয়ে শত শ্রোতার অন্তরে এক অননুভূতপূর্ব ভাবতরঙ্গ জাগিয়ে তুলল গ্যাণ্ডিনের বাঁশীর জাদু।

অবশেষে সে-বাজনার শেষ হল এক সময়। মুগ্ধ, অভিভূত শ্রোতারা কয়েক মুহূর্ত সময় নিল ভাবের ঘোর কাটিয়ে উঠবার জন্য। তারপরে শতকণ্ঠে তারা ফেটে পড়ল অবাধ অজস্র প্রশস্তি গানে। স্বয়ং রাজাও আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন —"সার্থক শিক্ষা আপনার স্যার গ্যাণ্ডিন। এক একবার মনে হচ্ছিল দেবগায়ক অর্ফিউসেরই বাঁশী শুনছি যেন।"

গ্যাণ্ডিন মাথা নুইয়ে ধন্যবাদ জানালেন রাজাকে, তারপর মাথা তুলে হাসিমুখে নিবেদন করলেন— "এইবার তাহলে আমার পারিশ্রমিক দিন রাজা!"

পা-রি-শ্রমিক ! তাই ত ! এমন স্বর্গীয় সংগীতেরও কাঞ্চনমূল্য আছে। দেবশ্রীমণ্ডিত ঐ কলেবরখানির ভিতরে যে হৃদয়খানি আছে, তা অর্থ-লালসায় পঙ্কিল। ধিক ! নাইটকুলের কলঙ্ক এই গ্যাণ্ডিন, অতুলনীয় সুরশিল্পী হওয়া সত্ত্বেও ওর আচরণ অন্ত্যজের মত।

কিন্তু রাজার মনের ভাব মুখে তিলমাত্রও প্রকাশ পেল না। স্মিতমুখেই তিনি বললেন—"প্রকাশ করুন স্যার গ্যাণ্ডিন, কত আপনাকে দিতে হবে। সহস্র স্বর্ণ হোক, দ্বি-সহস্র হোক, আমি ত প্রতিশ্রুতই আছি—যা আপনি চাইবেন, তাই দেব আপনাকে।"

"হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতিটা তাই ছিল বটে আমার মনোমত পারিশ্রমিকই দেবেন, এই কথাই বলেছিলেন আপনি। তাই দিন তাহলে। পৃথিবী দেখুক যে রাজা মার্ক মিথ্যাবাদী নন।"

রাজা স্পষ্টতঃই বিরক্ত হলেন একথায়। "পৃথিবী অনেক আগে থেকেই জানে যে, রাজা মার্ক মিথ্যাবাদী নন। আপনার পারিশ্রমিকের পরিমাণ প্রকাশ করুন।"

"পরিমাণ নয়, স্বরূপ। আগেই বলেছিলাম, সেটা অসাধারণই মনে হবে আপনার। শুনুন রাজা, পারিশ্রমিক হিসাবে হাজার বা দু-হাজার, এমন কি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রাও আমার কাম্য নয়। আমি চাই তার চেয়েও মূল্যবান, আপনার কাছে তার চেয়েও আদরের এক বস্তু—"

সভাসদেরা কেউ কেউ চেঁচিয়ে উঠলেন—"কর্ণওয়ালের রাজ্যটাই বুঝি ? সেটা দিয়ে দেবার অধিকার রাজার নেই। আমাদের দেশ, আমরা তাকে ভিখিরির ঝোলায় ফেলে দিতে দেব না রাজাকে।"

মার্ক তাঁদের নিরস্ত করতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই গ্যাণ্ডিন বলে উঠলেন—"আপনারা আশ্বস্ত হোন, আপনাদের দেশের উপরে কোন লোভই নেই আমার আমার লোভ যে বস্তুর উপরে, তার উপরে একমাত্র রাজা মার্কের ছাড়া অপর কোন কর্ণওয়ালবাসীর কিছুমাত্র স্বত্ব বা স্বামীত্ব নেই। এক কথায়, আমার প্রার্থিত পারিশ্রমিক হলেন রানী ইসুল্ট। আমি তাঁকেই চাই।"

নির্মেঘ আকাশ থেকে সভার মাঝখানে বজ্রপাত হল যেন।

কী হবে সেসব বর্ণনা করে ? রানী ইসুল্ট শোনামাত্র অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। রাজা প্রস্তরমূর্তির মত নিস্পন্দ হয়ে রইলেন। সব সভাসদ তরবারি খুলে শিরচ্ছেদ করতে ছুটলেন ধৃষ্ট পাষণ্ড ঐ নরাধম বাঁশুড়েটার—

এ সব ছবি বর্ণনায় ফোটানো শক্ত। চোখ বুজে বসে কল্পনানেত্রের সমুখে প্রত্যক্ষবৎ দেখতে যারা পায়, তাদেরই গল্প পড়া সার্থক।

শেষ পর্যন্ত গ্যাণ্ডিনের প্রার্থনা পূর্ণ হল বই কি ! সভাসদবর্গের মধ্যে প্রবীণ স্থিতধী ব্যক্তিও দুই চারজন ছিলেন ত ! তাঁরা এগিয়ে এসে চেষ্টা করলেন গ্যাণ্ডিনকে দিয়ে তাঁর এই অসঙ্গত দাবি প্রত্যাহার করিয়ে অন্য পারিশ্রমিক প্রার্থনা করাতে। তারপর সে চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, তখন তাঁরাই রাজাকে বললেন—"এ এক অগ্নি-পরীক্ষায় পতিত হয়েছেন আপনি। পৃথিবী যাঁকে চিরদিন সত্যসন্ধ বলে জেনেছে, আজ কি তাঁকে জানবে প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গকারী মিথ্যাচারী বলে ? সতীর মর্যাদা ভগবান রক্ষা করবেন। রাজা রাজকর্তব্য পালন করুন।"

রাজা রাজকর্তব্য পালনই করলেন।

আগে আগে ঘোড়ায় চলেছেন স্যার গ্যাণ্ডিন। তাঁর পিছনে একখানা চতুর্দোল, তাতে অর্ধমূর্ছিতা ইসুল্ট চলেছেন এক প্রতারক নাইট-কুলকলঙ্কের গৃহে লাঞ্ছনার জীবন যাপন করতে

বন্দিনী রানীকে নিয়ে গ্যাণ্ডিন নিরাপদেই উত্তীর্ণ হলেন সমুদ্রকূলে। নিরাপদেই। কারণ, সহস্রকণ্ঠে তাঁর উদ্দেশে জনগণের ধিক্কার আর অভিসম্পাত ক্রমাগত উচ্চারিত হচ্ছিল যদিও, রাজার কঠিন নির্দেশে গ্যাণ্ডিনের গতিরোধের চেষ্টা থেকে সবাই বিরত থেকেছে।

সমুদ্রতীরে উপনীত হয়ে গ্যাণ্ডিনের গতি কিন্তু আপনা থেকেই রুদ্ধ হল। সমুদ্রে এখন পুরো ভাটির টান। শক্ত ডাঙ্গা থেকে জলরেখার দূরত্ব পাকা দুই মাইল, সেই দুই মাইলের ভিজে বালির উপর দিয়ে না চলতে পারে গ্যাণ্ডিনের ঘোড়া সওয়ার নিয়ে, না এগুতে পারে চৌদোল বাহকেরা হতচেতনা রানীকে বহন করে। তা ছাড়া, এ-সৈকতে স্থানে স্থানে চোরাবালি আছে, তাতে ঘোড়া বা মানুষের পা পড়েছে কি সে তলিয়ে যাবে অতলে। গ্যাণ্ডিন সে-ঝুঁকি নিতে পারেন কি?

অসমসাহসী, হঠকারী ঐ গ্যাণ্ডিন। নিজের ভাগ্যের উপরে অবিচল প্রত্যয় তাঁর। কর্ণওয়ালের বুকের মধ্যে থেকে স্রেফ বুদ্ধিবলে তাঁর রানীকে ছিনিয়ে আনতে পেরে সে আত্মপ্রত্যয় এই মুহূর্তে অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। জলে-স্থলে চোরাবালিতে তাঁর জয়যাত্রাকে ব্যাহত করবার শক্তি আজ কোন কিছুর নেই, এই তাঁর বিশ্বাস।

চৌদোল-বাহকদের তিনি হুকুম দিলেন—"আমি আগে আগে যাচ্ছি, ঠিক আমার পিছনে পিছনে তোমরা চলে এস"—এই বলে সৈকতে তিনি ঘোড়া নামিয়ে দিলেন। বাহকেরা আর করে কী? রাজা মার্ক আদেশ দিয়ে দিয়েছেন—"এই নাইটের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে তোমরা।" সে-আদেশ ত না মেনে উপায় নেই।

খুব ধীরে ধীরে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বালির রাজ্যটা পরখ করতে করতে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুতে লাগলেন গ্যাণ্ডিন। শিক্ষিত ঘোড়ার পথহীন স্থানে পথ আবিষ্কার করার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা থাকে। গ্যাণ্ডিন রাশ আলগা দিয়েছেন, ঘোড়া চলেছে নিজের বিচার বুদ্ধিমত। কখনো সোজা, কখনো এঁকে বেঁকে শক্ত বালির উপরে পা ফেলে ফেলেই সে চলেছে।

হঠাৎ—ফোঁস্! একটা অনতিবৃহৎ কাল সাপ ফণা তুলল ঠিক ঘোড়ার সামনেই। আয়ারল্যাণ্ডে সাপ নেই। কাজেই এ-ঘোড়া সাপ দেখেনি কখনো। অদৃষ্টপূর্ব জীবকে সহসা সমুখে দেখে ভয় পেয়ে গেল ঘোড়াটা, আর আত্মরক্ষার তাগিদে দিল পাশের দিকে লাফ। লাফ দেওয়া মাত্র সে পড়ে গেল চোরাবালিতে, চোখের পলকে তার চার পা হাঁটু পর্যন্ত তলিয়ে গেল।

গ্যাণ্ডিন লাফিয়ে নামলেন ঘোড়ার পিঠ থেকে। ভাগ্য ভাল, শক্ত বালিতেই পড়লেন। এর পরে সৈকত ভেঙ্গে জাহাজের দিকে এগুতে সাহস হল না তাঁর। ঘোড়াটি বিসর্জন দিয়ে পায়ে পায়ে তিনি ফিরে এলেন শক্ত মাটিতে। এবার চতুর্দোল তাঁর পিছনে নয়, আগে আগে।

উপায় নেই। অপেক্ষা করতেই হবে। জোয়ার আসুক আবার। চড়া ডুবে যাক। জাহাজ থেকে নৌকা আসুক! আছে, নৌকা একখানা জাহাজেই আছে। ঐ যে ভাসছে জাহাজের গায়েই। জোয়ার জলের সঙ্গে সঙ্গে ঐ নৌকা কূলে এসে তুলে নিয়ে যাবে গ্যাণ্ডিনকে।

কূলে এসে বাহকেরা আর অপেক্ষা করতে রাজী হল না। এক গাছের ছায়ায় রানীকে দোলাসুদ্ধ নামিয়ে দিল তারা, তারপর চোখের জল ফেলে নগরে ফিরে গেল। দোলার দাম তারা রাজার কাছ থেকে নিয়ে নেবে।

গ্যাণ্ডিন সেই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চাইছেন, এমন সময় হঠাৎ অতি মধুর

বীণার ধ্বনি কানে এল তাঁর। চমকে উঠে এদিক ওদিক চাইতেই তিনি দেখতে পেলেন, নিকটেই অন্য এক গাছের ছায়ায় বসে এক সুদর্শন যুবক আপন মনে বীণা বাজিয়ে চলেছেন। একটা ঘোড়াও আপন মনে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে তাঁর আশে-পাশে।

আর একটা ব্যাপার দেখে বেশ খুশী হয়ে উঠলেন গ্যাণ্ডিন। যে-ইসুল্ট এতক্ষণ প্রাণহীনের মত পড়েছিলেন দোলায়, তিনি ঐ বীণার ধ্বনি শুনে উঠে বসেছেন আস্তে আস্তে। মুখখানা তাঁর রক্তহীন দেখাচ্ছিল এতক্ষণ, এই বারে যেন তাতে লালিমা ফুটছে আবার একটু একটু করে। তিনি যেন তন্ময় হয়ে শুনছেন ঐ বাজনা।

ভারী আনন্দ গ্যাণ্ডিনের তা দেখে। তিনি বীণাবাদককে ডেকে আনলেন কাছে—"বন্ধু! তুমি আর একটু বাজাও। মহিলাটি আনন্দ পাচ্ছেন তোমার বাজনা শুনে।"

"কে ইনি? এখানে এসময়ে কেন আপনারা?" —সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল লোকটি।

"কে ইনি তা জান না? তুমি কি এদেশের লোক নও?"

"না ত! সত্যিই আমি এদেশের লোক নই। বাড়ি আমার জার্মানিতে। বীণা বাজিয়ে দেশে দেশে ফিরি।"—এই বলেই লোকটি আবার ঝঙ্কার তুলল তার বীণায়।

সে-বাজনা এমন মধুর, এমন মর্মস্পর্শী যে, ইসুল্টের তো বটেই, পাষণ্ড গ্যাণ্ডিনেরও অন্তর থেকে বিশ্ব-সংসারের চিন্তা মুছে গেল তা শুনতে শুনতে। বেজেই চলেছে বীণায় রাগিণীর পরে রাগিণী, তানের পরে তান। কখন ওদিকে জোয়ার এসে গিয়েছে, কখন জাহাজ থেকে নৌকা খুলে এগিয়ে এসেছে কূলের দিকে, গ্যাণ্ডিনের তা কিছুই হুঁশ নেই। হুঁশ হল—নৌকার আরোহীরা যখন

এক সুদর্শন যুবক আপন মনে বীণা বাজিয়ে চলেছেন।

হল্লা করে ডাকাডাকি শুরু করল "মালিক, মালিক" বলে। গ্যাণ্ডিনেরা গাছের তলায় বসে আছেন, নৌকা থেকে তাঁদের দেখতে পাচ্ছে না নাবিকেরা, আথাল-পাথাল ঢেউয়ের দরুন।

এইবার হুঁশ হল গ্যাণ্ডিনের, আর তিনি অমনি কূলের দিকে ছুটে গেলেন নাবিকদের ডাকে সাড়া দিতে দিতে—"এই যে, এদিকে! এদিকে! নৌকা এদিকে আন—নৌকা এইখানে ভিড়াও"—

হঠাৎ পিছনে এক অট্টহাসি! চমকে পিছন ফিরে তাকাতেই যা তাঁর চোখে পড়ল, তাতে ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার দেখলেন তিনি। সেই বীণাবাদক বসে আছে তার ঘোড়ায়। একা সে নয় ঘোড়ার পিঠে, তার পিছনে বসে আছেন রানী ইসুল্টও। অট্টহাসিটা হেসেছে সেই বীণাবাদক। সে এখন বলছে—"আমি সত্যিই এদেশের লোক নই মশাই! তবে মাঝে মাঝে এদেশে বেড়াতে আসি, কারণ রাজা মার্ক আমার পুরানো বন্ধু। নাম আমার

স্যার ট্রিস্টান। আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সাহস যদি হয় আপনার, যে-কোন দিন যে-কোন জায়গায়—"

গ্যাণ্ডিন ছুটে আসছেন দেখে স্যার ট্রিস্টান ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। সত্যিই তিনি অনেকদিন পরে আজ এসেছিলেন এ-নগরে। নগরে ঢুকতেই রুদ্যমান নাগরিকদের মুখ থেকে ইসুল্টের ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। পেয়েই ছুটে গিয়েছিলেন সমুদ্রের দিকে, যা-হোক কিছু একটা করবার সংকল্প নিয়ে। ভগবানের কৃপা সমুদ্র-সর্পের আকারে এসে সে-সংকল্প সাধনে সাহায্য করেছিল তাঁর।

রাজা মার্কের দরবারে সেদিন রাত্রিবেলাও মহাভোজ। আলোর মালায় ঝলমল সভাগৃহে সকালবেলার মত এই সন্ধ্যাতেও উঠছে সংগীতের ঝংকার, রাজা রানী আর সভাসদ্‌বর্গকে বিমোহিত করে। তফাৎ শুধু এই যে, তখন ঝংকার উঠছিল গ্যাণ্ডিনের বাঁশীতে, এখন উঠছে ট্রিস্টানের বীণাযন্ত্রে।*

* গটফ্রিড ফন স্ট্র্যাসবার্গ-এর "ট স্টান" অবলম্বনে

উদাসীন মন

পূরবী দেবী

জার্মানী থেকে পালিয়ে শেষ অবধি আমেরিকার নিউ জার্সীতে এসে স্থায়ী ভাবে বাস করতে শুরু করলেন বিশ্ব-বিখ্যাত আইনস্টাইন। সেখানে ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভ্যান্স স্টাডিতে তিনি লেকচার দিতেন।

আইনস্টাইন জাতিতে ইহুদী ছিলেন। জার্মানীতে ইহুদীদের উপর তখন অত্যাচার চলছিল। জার্মানী থেকে পালিয়ে আসা সত্ত্বেও গুপ্তঘাতকের হাতে আইনস্টাইনের প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা তখনও দূর হয়নি। তাই তাঁর বাড়ির ঠিকানা কাউকে জানানো হত না।

একদিন আইনস্টাইন কোন কাজে বাড়ি ছেড়ে বাইরে গেছেন। এমন সময়ে ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভ্যান্স স্টাডি কলেজে একটা ফোন এল। তখন ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপ্যাল সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। সেখানে ছিল তাঁর ছেলে। ছেলে টেলিফোন ধরল। ফোনে শোনা গেল, একবার প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলব। ছেলে বললে—তিনি তো এখন নেই।

ফোনে আবার জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা বলতে পারেন, আইনস্টাইনের বাড়িটা কোথায়?

ছেলেটি ফোনটা প্রিন্সিপ্যালের সেক্রেটারীর হাতে দিলে। সেক্রেটারী বললে, সে খবর জানাবার অধিকার নেই, আইনস্টাইনের বারণ আছে।

টেলিফোনে লোকটির কণ্ঠস্বর নেমে এসে চুপি চুপি বলার মত শোনাল—কাউকে দয়া করে বলবেন না। আমিই ডাক্তার আইনস্টাইন। আমি বাড়ি যাবার পথে, আমার বাড়ির পথ ভুলে গেছি।

আইনস্টাইনের ভোলা মন দেখে মনে হয় যারা সদাই চিন্তারাজ্যে ডুবে থাকে, খাওয়া থাকা পরা সম্বন্ধে তাদের মনটা উদাসীন হয়ে যায়।

আহোম রাজপুত্র কুলকর্ণী

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

হিমালয়ের বক্ষ বিদীর্ণ করে দক্ষিণমুখী মোড় নিয়েছে মহানদ সাম্পো। এইবার পূর্বভারত অতিক্রম করে তার কূলপ্লাবী জলরাশি ধাবিত হবে বঙ্গসাগরে অঙ্গ ঢেলে দেবার জন্য। এখন থেকে ব্রহ্মপুত্র তার নাম।

সেই দক্ষিণমুখী মোড়ের উপরে একটা অধিত্যকা। পর্বতের উচ্চতা পরিমাপের ব্যবস্থা তখন কোন দেশেই ছিল না। তবে আজকালকার হিসাবে সেই বন্ধুর ভূখণ্ডের উচ্চতা অন্ততঃ বারো তেরো হাজার ফুট ত ছিলই!

সেই ভূখণ্ডটা জুড়ে শিবির সন্নিবেশ করেছেন তিব্বতের পরাক্রান্ত রাজা গুইদাল কুকলাম্বো। সৈন্যসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের কম নয়। সবাই তারা পদাতিক। যদিও পাহাড়ী খচ্চর পলটনের সঙ্গে হাজার দুইয়ের মত আছে। আছে, কিন্তু যুদ্ধে তাদের ব্যবহার বড় একটা হয় না। প্রধানতঃ মাল বইবার জন্যই ব্যবহৃত হয় তারা। কখনো কখনো বা রুগ্ন অঙ্গহীন সৈনিকেরাও কেউ কেউ চড়ে বসে তাদের পিঠে। লড়াই? তিব্বতী সেনা পায়দলে লড়তেই অভ্যস্ত চিরদিন। অবশ্য অহমিয়া সৈন্যেরাও তাই। তবে ইদানীং নৌযুদ্ধে নৈপুণ্যলাভের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে তারা; কামরূপ অঞ্চলের জনপদগুলিতে নৌকা ভিন্ন চলাই যায় না, তা পায়দলে লড়াইয়ের কথা ওঠে কেমন করে?

সে কথা থাকুক, তিব্বতী সেনা ভারতের মাটিতে হানা দিয়েছে। উত্তর-পূর্ব কোণের এই অজানা পাহাড়ে, মানুষের পা যেখানে এক যুগে একটা দিনও পড়ে না, সেখানে সৈন্যসমাবেশ করে তারা ক্রমশঃ তৈরি হচ্ছে দক্ষিণ পানে অনুপ্রবেশ করবার জন্য। অর্ধশতাব্দী পূর্বেও এই স্থানটা ছিল পুরাণপ্রসিদ্ধ কামরূপের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইদানীং কালচক্রের আবর্তন বশে হীনবল হয়ে পড়েছেন কামরূপের রাজবংশ। তারই সুযোগ নিয়ে পূর্বসীমান্তবাসী স্থানীয় অহোমেরা করেছে স্বাধীনতা ঘোষণা। নিজেদের বাসভূমিটুকুর নব-নামকরণ করেছে অহোম বা আসামভূমি। এখানকার রাজা এখন ইন্দ্রকর্ণী। রাজপুত্র কুলকর্ণীই বৃদ্ধ পিতার প্রতিনিধিরূপে অসামরিক সমস্ত রাজকার্য তত্ত্বাবধান করেন

আসাম-সীমান্তে তিব্বতী-হানার কথা কি সেই সব-কিছুর তত্ত্বাবধায়ক কুলকর্ণীর অজ্ঞাত ?

না, তা নয়। তিনটি মাত্র অহোম-সৈনিকের একটা চৌকি আছে এখানে। আছে সেই অধিত্যকারই উপরে, যার সুবিস্তীর্ণ এলেকা জুড়ে গুইদাল কুকলাম্বোর ছাউনি পড়েছে আজ পক্ষকাল পূর্বে।

চৌকি আছে, মানে অবশ্য চৌকি একটা ছিল। সাম্পোর কূলে কূলে তিব্বতী সেনাকে অগ্রসর হতে দেখেই আগেভাগে তারা নিজেদের পাথরের ঘরখানা ভেঙ্গে ফেলেছে, পাথরগুলোকে দিয়েছে সমানভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে, যাতে ধারে কাছে তাদের অস্তিত্বের কথাই জানতে না পারে তিব্বতীরা।

ঘরদোর ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দেবার পরে তিনজন চৌকিদারের মধ্যে দুইজন ধাবিত হয়েছে অহোম রাজধানী কর্ণিকাপুরের অভিমুখে, একজন রয়ে গিয়েছে শত্রুর গতিবিধির উপর নজর রাখবার জন্য। রাজদরবারে খবর দেবার জন্য একজন গেলে কি চলত না? এ নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল তিন চৌকিদারে। প্রধান চৌকিদার শাকুরাসং বলেছিল—"লম্বা পথ, বিপদে আপদে ভরা পথ। একজন যদি যায়, আর সে যদি মারা পড়ে বা অসুখেও পড়ে, তাহলে জরুরী খবরটা পাবে না রাজা। দুইজন যা তোরা। একজনের অসুখ করলে অন্যজন তাকে ফেলে রেখে এগিয়ে যাবে খবর পৌঁছোবার জন্য। আমাদের জানের কী দাম? দেশ যখন বিপন্ন?"

শাকুরাসং রয়ে গিয়েছে অধিত্যকায়। ধারে কাছেই আছে তিব্বতীদের। কিন্তু ধরা ছোঁয়ার ভিতরে নেই। ছাউনিটার ঠিক মাথার উপরে আছে একটা ন্যাড়া টিলা। তার ভিতর থেকে কুরে কুরে বার করে ফেলেছে শাকুরাসং, নিজের বাসস্থান করে নিয়েছে সেই গর্তটাকেই। ভিতরে ঢুকে টুকরো টুকরো পাথর আলগাভাবে আবার সাজিয়ে দেওয়া যায় যদি, নিশ্বাস নেওয়ার মত অল্পস্বল্প হাওয়া ঢুকবে পাথরের ফাঁক দিয়ে, অথচ ভিতরে অহোম প্রহরীর অস্তিত্বের কথা জানতেও পারবে না তিব্বতীরা। অন্ততঃ পারবে না বলেই আশা করছে শাকুরাসং। পারেই যদি, ধরা পড়ে যেতে হবে। মারা পড়াই সম্ভব সে ক্ষেত্রে। কিন্তু তা বলে ত আর কাজ ফেলে পালানো যায় না।

গুইদাল কুকলাম্বো পনেরো দিন চুপচাপ বসে আছেন ছাউনিতে। কী করছেন তিনি? অভিযানে বেরিয়ে কেউ পক্ষকাল সময় অপচয় করে না শত্রুর সিংহদ্বারে। অবশ্য কুকলাম্বোর খুবই বিশ্বাস, তাঁর এ শুভ আগমনের বার্তা কর্ণিকাপুরের কর্তাদের কর্ণে এখনো প্রবেশ করেনি। করে থাকে যদি, সেটাকে একটা পরমাশ্চর্য ব্যাপার বলেই গণ্য করতে হবে। অহোম রাজ্যের এই সুদূর সীমান্তটা একান্তই জনমনুষ্যহীন। তায় আবার এ-অঞ্চলে হালে গজিয়ে উঠেছে যে অর্বাচীন রাষ্ট্রটা, অহোম রাজ্য নাম যার, তার রাজা হলেন বুড়ো। রাজার ছেলেটা আবার নিতান্ত ছেলেমানুষ। এই দুইয়ের পরিচালনায় রাষ্ট্রতরণী নিশ্চয়ই তেমনি করে ঘুরপাক খাচ্ছে, যেমন করে ঘুরপাক খাওয়া যে কোন ডিঙ্গি নৌকোর পক্ষে অনিবার্য হবে, যদি কর্ণধারহীন অবস্থায় তাকে এনে ভাসিয়ে দেওয়া হয় সমুখের ঐ মহানদ সাম্পোর স্রোতে।

না, রাজ্যের প্রশাসন নিশ্চয়ই খুব দুর্বল। এ সীমান্তের কোন খবর নিশ্চয়ই রাজার বা রাজপুত্রের কাছে পৌঁছোচ্চে না। এ অবস্থায় তড়িঘড়ি দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে না পড়লেও চলে। বিশেষ করে সম্মুখযুদ্ধের পক্ষে প্রশস্ত দিনটা আসতে যখন দেরি আছে এখনো। মংনোটাং বিহারের প্রধান লামা প্রভুপাদ ফুচেন-চাওয়া-মিং অনেক আঁক কষে দিন ধার্য করে দিয়েছেন—ফাল্গুনের শুক্লা

ত্রয়োদশীতে সম্মুখীন হতে হবে ভারতীয়দের। আগে বা পরে হলেও যুদ্ধজয় আটকাবে না, কিন্তু যুদ্ধটা দীর্ঘকাল ধরে চলবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে তাতে। আর ঐ নির্দিষ্ট দিনে যদি যুদ্ধারম্ভ হয়, এক ঘায়ে শত্রু নিকাশ হয়ে যাবে।

কুকলাম্বো চানও তাই। এক ঘায়ে নিকাশ করে দিতে। তা যদি দেওয়া যায়, তাঁর নিজের বলক্ষয় যতই হোক, তাতে কিছু এসে যাবে না। কারণ অচিরেই তিব্বত থেকে আরও বিস্তর সৈন্য এসে যোগ দেবে তাঁর সঙ্গে। তখন সেই পরিপুষ্ট বাহিনী নিয়ে তিনি আক্রমণ করতে পারবেন পশ্চিম কামরূপ, পৌণ্ড্রবর্ধন এবং দক্ষিণে হরিকেল, ভাটিবাংলা। ক্ষুদ্র অহোম রাষ্ট্রটুকু দখলে আনবার জন্যই কি আর তিনি এত সমারোহ করে এত দূরে এসেছেন?

তাই অনেক বিচার বিবেচনা করেই তিনি সাম্পেলার মোড়ে অধিষ্ঠান করেছেন দুয়ারোহ অধিত্যকায়। সৈনিকদের বুঝিয়েছেন—"তোমরা দুর্জয় শীতের দেশের লোক। যেখানে তোমরা যাচ্ছ, সেখানকার আবহাওয়া শীতের দিনেও গরম লাগবে তোমাদের। শুধু গরম নয়, স্যাঁৎসেতে ভ্যাপসা। এখানে কয়েকদিন থাকতে হবে দেহটাকে সেই আবহাওয়ার উপযোগী করে নেওয়ার জন্য।"

এই কথাই সৈনিকদের বলেছেন কুকলাম্বো। যে কথা বলেননি, তা হল এই যে, তিনি কয়েকজন চর পাঠিয়েছেন ইতস্ততঃ। চারজনের একটা দল অহোম দেশে, দুইজনের আর একটা কামরূপে, দুইজনের আরও একটা হরিকেলে। এই দলগুলো যে রওনা হয়ে গিয়েছে, শাকুরাসং তা জানে। তার বাজপাখির বাসা থেকে সে তিব্বতীদের সব গতিবিধিই দেখতে পায়।

দেখতে পায় সে। আর দেখার পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও সে নিতে জানে। পিছনের পাকদণ্ডি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সে নামে। বনপথে কোন একটা ঝাঁকড়া গাছের ডালে, বা গিরিপথের কোন পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে অব্যর্থ লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ করে তিব্বতী চরেদের উপরে। তিনটি দলই সে এইভাবে মেরে সাবাড় করেছে। কুকলাম্বো নিরাপদ ছাউনিতে বসে তা কিছুই টের পাননি। শাকুরাসং নিজের কাজ সমাধা করে আবার ফিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে নিজের বাজপাখির বাসায়।

এদিকে শাকুরাসংয়ের দুই সঙ্গী? তারা অনেক আগেই রওনা হয়েছিল, পৌঁছেও গিয়েছে অনেক আগেই। তবে রওনা হয়েছিল দুইজন, পৌঁছেচে একজন। আর একজন সাপের ছোবলে ঢলে পড়েছিল। পড়তে পড়তেও সাথীকে বলেছিল —"তুই এক পলকও দেরি করিস না আমার জন্য। শাকুরাসং কী বলেছিল, মনে নেই? তোর আমার জানের কী দাম? দেশ যখন বিপন্ন?"

টেনে টেনে তাকে একটা গুহার মত জায়গায় রেখে গেল তার সাথী, তারপর সে সাথী আবার ছুটল কর্ণিকাপুরের দিকে। রাজধানীতে যখন পৌঁছালো, তখন রাত দুপুর। সংকেতবাক্য জানা আছে চর ও চৌকিদারদের। শব্দটি উচ্চারণ করা মাত্র কেল্লার দরোজা খুলে দিল দ্বাররক্ষী। বেরিয়ে এলেন মহাপ্রতিহার। সংক্ষেপে বৃত্তান্তটা শুনে নিয়ে তিনি আবার ছুটলেন ভিতরপানে। যুবরাজকে জাগাতে হবে ঘুম থেকে।

সেটা অবশ্য মোটেই কঠিন কাজ নয়। যুবরাজের ঢালাও হুকুম রয়েছে, দিবসে নিশীথে যে কোন সময়ে যে কোন লোক তাঁর সাক্ষাৎ পেতে পারে, সাক্ষাতের সঙ্গত কারণ থাকলে। অন্তঃপুরে তিনি শয়ন করেন না, এখনও বিবাহই করেননি। করার বাসনা আছে বলেও মনে হয় না। বয়স্যেরা কখনো সখনো ও প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে, হেসে

সেই রাত্রেই মন্ত্রী সেনাপতিবৃন্দকে আহ্বান করলেন মন্ত্রণাগৃহে।

বলেন—"রাজাদের কি বিয়ে করা সাজে? সংসার-আশ্রমের দায়িত্ব অনেক। সে সব যথাযথ পালন করতে গেলে রাজ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় থাকে না আর। আমায় তোমরা দুদিকে খাটাতে যেও না। দুটো দিকই নষ্ট হবে তাতে।"

"রাজা যদি বিয়ে না করেন, তাহলে ত রাজ-বংশই নির্বংশ হবে!"—আপত্তি তোলে বয়স্যেরা।

"বংশ? বংশ থাকার কি দরকার আছে কিছু? অপুত্রক রাজা স্বর্গে গেলেন। ব্যস, প্রজারা নিজেদের মধ্যে থেকে রাজা বেছে নিক একজন। গৌড় দেশের লোক তাই করেছিল, জান না? তার ফল কী রকম হয়েছিল, ভেবে দেখ। একটা সুনির্বাচনের ফলে ধর্মপাল, দেবপাল, বিগ্রহপাল—ধারাবাহিক সব কীর্তিমান রাজার উদয় হল গৌড়-বঙ্গের ভাগ্যাকাশে।"

কিন্তু সে কথা থাকুক, যুবরাজ কুলকর্ণিকে জাগাতে সময় লাগল কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। সীমান্তের চৌকিদারের সঙ্গে তাঁর কথা হল এক দণ্ডের মত সময়। তারপর চৌকিদার গেল বিশ্রাম করতে, রাজভবনেই তার আহার নিদ্রার ব্যবস্থা সে রাত্রির জন্য। তারপরের কাজ কুলকর্ণির—চারজন সৈনিক একটা হাতি নিয়ে চলে গেল বনের ভিতর থেকে সর্পদ্রংষ্ট চৌকিদারটিকে জীবিত বা মৃত, তুলে আনবার জন্য। দেশ যখন বিপন্ন, তখন ব্যক্তির জীবনের দাম নেই কিছু। কিন্তু জীবন যারা দেবে দেশের জন্য, দেশের মানুষ তাকে শ্রদ্ধা জানাতেও বাধ্য, দেবতার মত শ্রদ্ধা।

সেই রাত্রেই মন্ত্রী সেনাপতিবৃন্দকে আহ্বান করলেন মন্ত্রণাগৃহে। রাজা? না, বৃদ্ধ পিতাকে এত রাতে উত্ত্যক্ত করতে রাজী নন কুলকর্ণি, তাঁকে প্রভাতে জানালেই হবে। সব কিছু সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ত উপযুক্ত পুত্রকে তিনি আগেই দিয়ে রেখেছেন!

সিদ্ধান্ত কুলকর্ণিই নেবেন। নিয়েই বসে আছেন বলতে গেলে। সীমান্তে বৈদেশিক হানা! এ পরিস্থিতিতে নেবার মত সিদ্ধান্ত একটাই ত আছে। যুদ্ধ কর! হানাদারকে টুঁটি টিপে হত্যা কর! আর যদি সে দন্তে তৃণ নিয়ে মার্জনা ভিক্ষা করে, তাহলে পদাঘাত করে তাড়িয়ে দাও সীমান্ত পার করে। হ্যাঁ, সে সিদ্ধান্ত নেওয়াই আছে। পিতার আমলের প্রবীণ মন্ত্রী-সেনাপতিবর্গের সঙ্গে কুলকর্ণির পরামর্শ শুধু একটা বিষয়েই। সেটা হল এই যে, কীভাবে প্রতিরোধটা গড়ে তোলা হবে।

তিব্বতী সেনা অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার হবে। একথা বলেছে সদ্য-সমাগত ঐ সাহসী চৌকিদার। অস্ত্র তাদের তীর ধনুক, অসি, ভল্ল এবং মুদ্গার।

সঙ্গে খচ্চর অনেক, কিন্তু যুদ্ধ তারা পদাতিক হিসাবেই করে। কেন বলে আছে সাম্পো-অধিত্যকায়? সেটা দেখে শুনে বুঝে নিতে হবে। শাকুরাসং রয়েছে সেখানে, সে হয়ত এতদিনে জানতে পেরেছে কুকলাম্বোর অভিপ্রায়। "বিপদ আপদ না ঘটলে, সেক্ষেত্রে আমরা শাকুরাসংকে দুই একদিনের ভিতর এখানেই দেখতে পেতে পারি।"

অবশ্য তার আগমনের প্রতীক্ষায়, বা অন্য কোন কিছুরই প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্ট থাকবার পাত্র নন কুলকর্ণি। রাত্রি প্রভাতেই সারা দেশে পড়তে লাগল অবিরাম ঢাঁড়রা। "শত্রু এসেছে দুয়ারে! মারিয়া তাড়াও তাহারে। দুয়ারে এসেছে অরাতি। কেউ যেন না ফেরে দিতে বংশেতে বাতি। ড্যাং ড্যাং ড্যাডাম ড্যাং—"

অবশেষে শাকুরাসংও এল। এমন কিছু ঘটেছে যে তা চাক্ষুষ দেখার পরে আর কালবিলম্ব করা সে উচিত মনে করেনি। তিব্বত থেকে আরও একটা সেনাদল এসে পড়েছে। এরা সাম্পো পেরুতে পারেনি এখনো। কারণ বরফ-গলা জলের ঢল নেমেছে নদীতে, উত্তাল তরঙ্গে দুকূল ভাসিয়ে দিচ্ছে সাম্পো। নদীর ওপারে ছাউনি ফেলে অপেক্ষায় আছে এই নতুন বাহিনী। ঢলের জল কমলেই তারা নদী পেরুবে, এবং সোত্তর হাজারের মত সৈন্য নিয়ে কুকলাম্বো রণযাত্রা করবেন অহোম দেশের পানে। শাকুরাসংয়ের অবশ্য সেকথা জানবার কথা নয়, কিন্তু ফাল্গুনি শুক্লা ত্রয়োদশীর দিনই তিব্বতী অভিযান শুরু হবে। এবং তার আর দেরি নেই বেশী।

কুলকর্ণিও প্রস্তুত হচ্ছেন। বিপক্ষে সোত্তর হাজার? হোক না, ভয় পাওয়ার কী আছে? যে-প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন তিনি, সোত্তর লক্ষ তিব্বতীরও সাধ্য নেই যে তা লঙ্ঘন করবে।

সৈন্যবল? বলবার মত সৈন্য তাঁর কী আছে? পেশাদার সৈনিক একজনও নেই এ রাজ্যে। প্রয়োজনে লাঙ্গলখানা হাত থেকে নামিয়ে রাখে এদেশের লোক, সেই হাতে তুলে নেয় রামদা বা বল্লম বা তীর ধনুক। আবার যখন শান্তি ফিরে আসে, অস্ত্রখানা ঘরের চালে ঝুলিয়ে রেখে পরিত্যক্ত লাঙ্গল আবার তুলে নেয় হাতে। সৈন্য বলতে কিছু নেই আহোম দেশে।

তবে অবশ্য আছে মানুষ। এমন সব মানুষ, দেশকে মা-জ্ঞানে ভালবাসতে যাদের শিখিয়েছেন এই তরুণ কুলকর্ণিই। তাদের সংখ্যা দুই বা আড়াই লক্ষ হবে। অসমর্থ বৃদ্ধ আর শিশুদের বাদ রেখে নারী ও পুরুষ মিলিয়ে এক লক্ষ যোয়ানকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন কুলকর্ণি। কর্ণিকাপুরের কাছাকাছি কোথাও নয়। হাতে তীর ধনুক তরোয়াল বল্লম দিয়েও নয়। তারা সবাই চলে গিয়েছে সীমান্তেরই কাছাকাছি অরণ্যভূমিতে, কাজ শুরু করেছে সাম্পোর পশ্চিম কূলে একটা নীচু জায়গা বেছে নিয়ে।

হাতে অস্ত্র তাদের—এক একখানা কোদাল। দিবারাত্রি মাটি কাটছে তারা।

রণযাত্রার কয়েকদিন আগে থেকে কুকলাম্বো চর পাঠাচ্ছেন সবচেয়ে সুগম পথ খুঁজে বার করবার জন্য। চর পাঠাচ্ছেন রোজই। কিন্তু সে-সব চর ফিরে যাচ্ছে না তাঁর কাছে। একজনও না। আশ্চর্য লাগছে কুকলাম্বোর। কোথায় যাচ্ছে লোকগুলো? বাঘে খেয়ে ফেলছে নাকি তাদের? বিরক্ত হয়ে যাত্রার ঠিক আগের দিন পঞ্চাশটা লোক একসঙ্গে পাঠালেন তিব্বতী রাজা। সেদিন তাদের মধ্যে দশ বারোটা লোক ফিরল বটে, পালিয়ে এসেছে তারা।

"বাকী সব?"—গর্জে উঠলেন কুকলাম্বো।

"মারা পড়েছে। গাছের ঝাঁকড়া ডাল থেকে তীরের ঝাঁক আসছে—"

কলকল কল্লোলের সমুখে এসে থ' মেরে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা।

আর দেরি নয়! অহোমেরা আগু বাড়িয়ে এসেছে। এই পর্যন্তই এসেছে কুকলাম্বোর অগ্রগতি রোধ করবার জন্য। সাহস আছে ত এই শিশু-রাষ্ট্রের! সোত্তর হাজার শিক্ষিত সৈন্যের মোকাবিলা করবার জন্য হাঃ হাঃ হাঃ—তিব্বতীরা কী চীজ, তাই এইবার দেখিয়ে দিচ্ছেন কুকলাম্বো।

পরদিন বীর পদভরে মেদিনী কম্পিতা। সোত্তর হাজার সৈনিক চলেছে রণমদে প্রমত্ত। পার্বত্যবলয় পেরিয়ে অরণ্যবলয়ে ঢুকল তারা। আজ আর একটাও তীর আসছে না। একটাও সৈন্য মারা পড়ছে না কুকলাম্বোর। পালিয়েছে! অহোমেরা পালিয়েছে, তিব্বতী সেনাকে আগুয়ান দেখেই।

অহোমেরা পালিয়েছে ঠিকই, কিন্তু, কিন্তু ঐ তুমুল অট্টরোলটা কিসের? দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ করে যা ক্রমাগত হূ-হূ-হূ-হূ-রবে আকাশপানে উত্থিত হচ্ছে অরণ্যানীর আঁধার বক্ষ থেকে?

থেয়ে গেল সমগ্র বাহিনী। সোত্তর লক্ষ তিব্বতী সৈনিক।

হূ-হূ-হূ-হূ উত্তাল এক কলকল কল্লোলের সমুখে এসে থ' মেরে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। একটা নদী। সুপ্রশস্ত একটা নদী। ও কোথা থেকে এল? নদী ত এখানে ছিল না। বাঁয়ে তিব্বতীদের সাম্পো ওরফে ভারতীয়দের ব্রহ্মপুত্র। তারই থেকে রাতারাতি নদী বেরিয়েছে আর একটা। দেখলেই মনে হয়—সাম্পোর মতই তরঙ্গে তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ এ-নদী সাঁতরে পার হওয়ার চেষ্টা করলে বিপর্যয়ই ডেকে আনা হবে।

তবু সে-চেষ্টা না করে উপায় কী। নৌকা ত কুকলাম্বোর নেই, আর থাকলেও এ আথাল-পাথাল জলে নৌকা টিকবেই বা কেন?

সে চেষ্টা কিছুসংখ্যক সৈন্য করল বৈকি। ডুবেই অনেকে মরল তারা। যারা ডুবল না, ওপারের কাছাকাছি, অহোমদের তীরের পাল্লার ভিতরে আসা মাত্র শরবিদ্ধ হয়ে তলিয়ে গেল তারা।

বাঁয়ে ব্রহ্মপুত্র, ডাইনে যতদূর দৃষ্টি চলে, এই নতুন নদীর উত্তাল প্রবাহ, সে-প্রবাহের ওপারে আহোম তীরন্দাজ।

কুকলাম্বো ফিরে গেলেন, তাঁর সোত্তর হাজার সৈনিকের মধ্যে হাজার খানিককে কর্ণি-যমুনার জলে বিসর্জন দিয়ে। কুলকর্ণির সৃষ্টি সেই নতুন নদী কর্ণি-যমুনার শুকনো খাত—এখনো খুঁজলে দেখতে পাবেন অনুসন্ধিৎসুরা, উত্তর-পূর্ব সীমান্তের মহারণ্যের ছায়ায় ছায়ায়।

"বিভাবতী চ্যাটার্জী স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

সোনার নেউল

দিলীপকুমার বসাক

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ধার্মিক রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। এই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণ এবং গরিবদের মধ্যে প্রচুর ধন-রত্ন দু'হাতে বিলিয়ে দিলেন। রাজার এই রকম দানের ফলে লোকে রাজাকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। সবাই বলতে লাগল—এই রকম যজ্ঞ কেউ কোন দিন করেনি, কেউ কোন দিন দেখেনি।

যজ্ঞ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় কোত্থেকে একটি ছোট্ট নেউল এসে যজ্ঞের মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। তার শরীরের আধখানা অংশ সোনার। এই রকম অদ্ভুত নেউলকে এভাবে এসে যজ্ঞের মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দেখে সবাই অবাক্ হয়ে গেল। সকলে আরও অবাক্ হল যে, নেউলকে স্পষ্ট মানুষের মত কথা বলতে দেখে। যজ্ঞ-সভার ছোট বড় সকলে তখন নেউলের এই কাণ্ড দেখতে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। নেউল সুস্পষ্ট মানুষের কণ্ঠে বলে উঠল—তোমরা মিছে কথা বলছ? এ যজ্ঞ যজ্ঞই নয়। এ যজ্ঞ যদি সত্যিকা'রের যজ্ঞ হত তা হলে আমার বাকী আধখানা শরীরও সোনার হয়ে যেত।

উপস্থিত লোকদের মধ্যে থেকে কোন একজন জিজ্ঞাসা করলেন—এ সব তুমি কী বলছ নেউল? তুমি কি জান, আমাদের রাজা এই যজ্ঞেও কত ধন-রত্ন বিলিয়েছেন? অথচ তুমি এই যজ্ঞের নিন্দে করছ? এই যজ্ঞের প্রতিটি কাজ শাস্ত্রের ও মহাপুরুষের উপদেশ মত করা হয়েছে। কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয়নি।

মানুষের মত নেউল হেসে উঠল, বলল—অত কথা জানবার আমার দরকার নেই। তবুও আমি বলছি, এই যজ্ঞ যজ্ঞই নয়।

সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন বলে উঠলেন—তোমার কথার কী প্রমাণ?

—প্রমাণ আমি নিজে এবং আমার শরীর।

সবাই আশ্চর্য হয়ে নেউলের কথা শুনতে লাগলেন।

নেউল বলতে লাগল—আমি একটি যজ্ঞ দেখেছিলুম, সে কথাই আজ তোমাদের কাছে বলছি।

কুরুক্ষেত্রে একজন ধার্মিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি বিশেষ কিছু উপার্জন করতে পারতেন না, ভিক্ষে করেই তাঁর দিন চলত। স্ত্রী, একটি ছেলে ও বউ নিয়েই ব্রাহ্মণের পরিবার। ব্রাহ্মণ ভিক্ষে করে যা পেতেন তা দিয়ে অতিথি অভ্যাগতের সেবা করে যা পড়ে থাকত তা দিয়ে চারজনে ভাগ করে খেতেন। এই ভাবেই তাদের দিন বেশ কেটে যেত।

কিছুকাল পরে সেই দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ব্রাহ্মণ রোজই ভিক্ষায় বেরিয়ে যান, কিন্তু প্রায় দিনই শূন্য হাতে ফিরে আসেন। ব্রাহ্মণের বাড়িতে উপোস আরম্ভ হয়ে গেল। ক'দিন উপোসের পর ব্রাহ্মণ একদিন খানিকটা যব পেলেন। যবগুলো পেয়ে ব্রাহ্মণ পরিবারের আনন্দের সীমা রইল না। তাই দিয়ে ছাতু তৈরি করলেন।

ছাতু চারটি ভাগে ভাগ করা হল। তাঁরা খেতে বসবেন, এমন সময় তাঁদের দরজায় একজন অতিথি এসে উপস্থিত হলেন। অতিথি ক্ষিদেয় অত্যন্ত কাতর। ব্রাহ্মণ তাঁকে পরম আদরে ভিতরে নিয়ে এলেন। অতিথি বললেন—ক্ষিদেয় আমার প্রাণ যায়। শীগ্‌গির আমায় খাবার দিন।

ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তাঁর নিজের ভাগটি নিয়ে এসে অতিথিকে খেতে দিলেন। অতিথির এত

ক্ষিদেয় আমার প্রাণ যায়। শীগ্‌গির আমায় খাবার দিন।

ক্ষিদে পেয়েছিল যে, অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সবটুকু ছাতু শেষ করে ফেললেন। খেয়ে-দেয়ে অতিথি বললেন—এ খাবারে আমার কিছুই হয়নি। আরও দিন।

ব্রাহ্মণ ভাবিত হয়ে পড়লেন, আর কী দিয়ে তিনি অতিথিকে তৃপ্ত করবেন! ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখে তাঁর পরিবার সবই বুঝতে পারলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে ডেকে বললেন—কেন তুমি অত ভাবছ? আমার ভাগটাও অতিথিকে দাও। অতিথি যে দেবতা। তাঁর সেবা সকলের আগে।

ব্রাহ্মণ বললেন—উপোস করে করে তোমার শরীরে ক'খানা হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই। তোমার ভাগটা আজ আমি কী করে দিই বল?

গিন্নী জোর করে বললেন—না গো না, অতিথি বসে আছেন। যাও, শীগ্‌গির তুমি আমার ভাগটা তাঁকে দাও। তোমার ধর্ম আমার ধর্ম যে এক। তোমার কর্তব্যে ত্রুটি হলে সে ত্রুটি যে আমারও হয়। তোমার কোন কথা আমি শুনব না। যাও, আমার ভাগ দিয়ে অতিথির সেবা কর।

আর কোন উপায় না দেখে ব্রাহ্মণ শেষকালে তাই করলেন। কিন্তু অতিথি সেই ভাগটুকুও অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে বললেন—আর কী আছে আমায় দিন। ক্ষিদেয় আমি মারা গেলুম।

ব্রাহ্মণ ফাঁপরে পড়লেন। তাঁর অবস্থা দেখে তাঁর ছেলে বললেন—বাবা, আপনি ভাববেন না। আমার ভাগ তো রয়েছে, অতিথিকে আপনি তাই দিন।

ব্রাহ্মণের মনে বড় দুঃখ হল। কিছুতেই তিনি ছেলের ভাগটা নিতে পারছিলেন না। কিন্তু এদিকে অতিথি তাড়া দিতে লাগলেন। উপায় কি? শেষকালে ব্রাহ্মণ ছেলের ভাগটি নিয়ে অতিথিকে দিলেন। অতিথি তাও শেষ করে বললেন—এখনও আমার ক্ষিদে রয়েছে। আপনাদের ঘরে আর কি কিছু নেই?

ব্রাহ্মণ ভয়ানক ভাবিত হয়ে পড়লেন। তখন বউএর ভাগটুকু মাত্র বাকী আছে। কিছুতেই তিনি তা দিতে পারলেন না। অথচ অতিথি তখন তৃপ্ত হননি। কি করবেন ভেবে না পেয়ে তিনি দুঃখিত অন্তরে দাঁড়িয়ে রইলেন। শ্বশুরের এই অবস্থা দেখে বউ তার ভাগটুকু হাতে নিয়ে বললেন—আপনি অত ভাবছেন কেন? এখনও তো আমার ভাগ রয়েছে, তাই নিয়ে আপনি অতিথিকে দিন।

বউয়ের কথায় ব্রাহ্মণ আর নিজেকে সামলাতে না পেরে কেঁদে ফেললেন। বললেন—মা, আমাদের বুড়ো হাড়ে যা সইছে, তোমার কচি

শরীরে তা সইবে কেন? তোমার মুখের দিকে আমি যে চাইতে পারি না। না খেয়ে না দেয়ে তোমার শরীরখানা কি হয়েছে?

শ্বশুরকে সান্ত্বনা দিয়ে বউ বলল—আপনি দুঃখ করবেন না বাবা। আপনি যে আমার গুরুর গুরু, দেবতার দেবতা। আপনার সামান্য মাত্র সেবা করতে পারলে আমি কত যে আনন্দ পাই, আপনি তো তা জানেন বাবা। অতিথি বসে আছেন, আপনি আর দেরি করবেন না। এ ছাতুগুলো নিয়ে অতিথির সেবা করুন।

একরকম জোর করেই বউ তার শ্বশুরের হাতে ছাতুগুলো দিয়ে দিলে। ব্রাহ্মণের হাত তখন কাঁপছিল। সকলের ভাগই তিনি অতিথিকে দিয়েছেন। শেষকালে এই কচি মেয়েটির মুখের গ্রাসও কেড়ে নিয়ে অতিথির সেবা করতে তাঁর হাত সরছিল না। কিন্তু অতিথির সেবা যে করতেই হবে। তিনি বউয়ের ভাগটিও অতিথিকে দিলেন।

অতিথির রাক্ষুসে ক্ষিদে শান্ত হল। অত্যন্ত খুশী হয়ে ব্রাহ্মণকে আশীর্বাদ করতে করতে তিনি চলে গেলেন।

মানুষের সারা জীবন ধরে চলে পরীক্ষা। ভগবান নানা ভাবে মানুষকে পরীক্ষা করেন। ব্রাহ্মণ পরিবারটি উপবাসে জীবনের একেবারে শেষ সীমানায় এসে পৌঁচেছিলেন। আর তারা বাঁচতে পারলেন না। সেই দিন রাত্রে চারজনই মারা গেলেন।

নেউল বলল—আমি সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতেই থাকতুম। আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাই আমি দেখেছি। যেখানটায় বসে অতিথি খেয়েছিলেন, সেখানকার মাটিতে সামান্য কিছু ছাতু পড়েছিল। আমার তখন কী ভাব হল, আমি গিয়ে মাটিতে সেই ছাতুর উপর গড়াগড়ি দিতে লাগলুম। তাতেই আমার শরীরের আধখানা সোনার হয়ে গেল। বাকী আধখানা সোনার করার জন্য আমি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছি। ছোট বড় যেখানে যে যজ্ঞ হচ্ছে সেখানে গিয়েই আমি গড়াগড়ি দিচ্ছি। কিন্তু আমার কিছুই হচ্ছে না। এখানে এসেও আমি গড়াগড়ি দিলুম, কিন্তু আমার শরীরের কোন পরিবর্তন হল না।

এই জন্যই আমি বলেছিলুম, এ যজ্ঞ যজ্ঞই হয়নি। ভিখিরি ব্রাহ্মণ অতিথি সেবার জন্য যে যজ্ঞ করেছিলেন, তার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের তুলনা হয় না।

মেদিনীপুর জেলার সোনাখালী হইতে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল তাঁর স্বর্গগতা কন্যা বনশ্রী মণ্ডলের স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন।

তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

বনশ্রী মণ্ডল স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু:

মহানুভবতা সম্পর্কে মৌলিক গল্প

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ: ২৯শে আশ্বিন ১৩৮৩। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী পৌষ সংখ্যা শুকতারায় প্রকাশিত হবে। প্রতিযোগিতার কোনও লেখা ফেরত পাঠান হয় না।

প্রথম পুরস্কার ১৫·০০ টাকা ● দ্বিতীয় পুরস্কার ১০·০০ টাকা

"৺বিভাবতী চ্যাটার্জী স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

শশক থেকে শশধর

অপূর্বকুমার সর

ভারতবর্ষ ভক্তিবাদের দেশ। অনেকে বলে থাকেন, এর অণু-পরমাণুতে আছে ভক্তির জোয়ার। নানা দিক দিয়ে এর স্ফুরণ ঘটে থাকে। অতিথি নারায়ণ এই কথাটা প্রবাদস্বরূপ। কবে কে কোথায় এই কথা বলেছিলেন তা ঠিক জানা নেই। তবে অতিথিকে এখনও এই বস্তুতান্ত্রিক যুগেও সকলে ভক্তি করে; তার সেবায় ধন্য হয়। প্রাচীনকালে দধীচি মুনি অতিথি-সৎকারের জন্য দেহত্যাগ করেছিলেন; অম্বরীষ রাজা দুর্বাসা-অতিথির জন্য তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও জলস্পর্শ করেননি। এরই সমধর্মী এক কাহিনী তোমাদের বলতে বসেছি। তোমরা আকাশে চাঁদ দেখেছ। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ চাঁদের গায়ে কলঙ্ক আছে। বিজ্ঞানে পড়েছ ওগুলো আসলে বড় বড় গহ্বর, খানাখন্দ ইত্যাদি। কিন্তু তোমরা যদি একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য কর দেখবে, এই কলঙ্কগুলো মিলে একটি নিখুঁত শশকের মূর্তি সৃষ্টি করেছে। তোমরা নিশ্চয় জান না এর পিছনে লুকানো আছে একটি অপূর্ব অতিথি-সৎকারের কাহিনী এবং এর জন্যই চাঁদের আর এক নাম শশধর। শশককে ধারণ করেছে, তাই শশধর। কাহিনীটা বলেই ফেলি।

দিগন্তবিস্তৃত গভীর অরণ্য। দিনের বেলাতেও সূর্যকিরণের তীক্ষ্ণ ময়ূখ ভিতরে প্রবেশ করে না। এই অরণ্যের মাঝখানে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা। সেখানে বাস করে চার বন্ধু। একটি খরগোশ বা শশক, একটি ভোঁদড়, একটি বানর ও একটি শিয়াল। এই চার বন্ধুতে খুব সদ্ভাব। চার-জনেই বড় ধার্মিক, কারও হিংসা করে না, বরঞ্চ উপকার করার চেষ্টাই করে। এই চারজনের গুণের কথা বনের সকল পশু-পক্ষী ছাড়া বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

এমন সময় একদিন শুরু হল প্রচণ্ড বর্ষা। সাত দিন ধরে সে বৃষ্টির বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। সাত দিন পর সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি থেমে গেল, সন্ধ্যায় আকাশে দেখা দিলেন চন্দ্রদেব। এই সাত দিন ধরে চার বন্ধু উপবাসী। এক কণা খাদ্যও তারা সংগ্রহ করতে পারেনি। অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় তারা খাদ্য সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। ভোঁদড় অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে একটা ছোট মাছ ধরে আনল, বানর বহু কষ্টে সংগ্রহ করল কয়েকটি বন্য ফল, শিয়াল ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে শেষপর্যন্ত সিংহের পরিত্যক্ত কয়েক টুকরা মাংস নিয়ে এল। খরগোশ নিয়ে এল সামান্য কচি মিষ্টি তৃণ। এবার খাওয়া শুরু হবে। হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হলেন এক সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে কাতর কণ্ঠে সন্ন্যাসী বললেন—তোমরা আমায় কিছু খেতে দিতে পার? ক্ষুধায় বড় কাতর হয়েছি। এই সাতদিন বৃষ্টির ফলে কোথাও মাধুকরীতে বেরোতে পারিনি—তাই খাওয়াও হয়নি।

চার বন্ধুই খুব আগ্রহসহকারে আপ্যায়ন করল অতিথিকে। বলল—বসুন বসুন, আমরা এখনই আপনার আহারের ব্যবস্থা করছি। মুখে তো বলল, কিন্তু চার বন্ধুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তাদেরই আহার যোগাড় হয় না তো সন্ন্যাসীর আহার কোত্থেকে জোটাবে তারা? শেষে স্থির হল, তাঁদের অতি কষ্টে সংগ্রহ করা আহার্যই তুলে দেবে সন্ন্যাসীর হাতে। শিয়াল, বানর ও ভোঁদড় তো নির্দ্বিধায় তাদের খাদ্য তুলে দিল সন্ন্যাসীকে, কিন্তু মুশকিল হল খরগোশের। সাধুবাবা পরম সন্তোষের সঙ্গে তিনজনের আহার গ্রহণ করে ফিরলেন খরগোশের দিকে। বললেন—তোমার ভিন্ন বন্ধু

তো তিনটি খাদ্যবস্তু দিল, কিন্তু এতে আমার পেট ভরবে না। তুমি কি কিছু দেবে না?

খরগোশ তো ভেবে আকুল। সে ক্ষুদ্র প্রাণী। বনের কচি তৃণ খায়। তৃণ তো আর অতিথিকে খেতে দেওয়া যায় না! অথচ অতিথি ক্ষুধার্ত, তাঁকে খেতে না দেওয়াও মহাপাপ। চিন্তার পাহাড় ভেদ করে কি আবিষ্কার করে সে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। বলল—আমিও আপনাকে খাবার দেব বইকি! তবে আপনাকে এক কাজ করতে হবে। আপনি দয়া করে একটু আগুন জ্বালুন। তাহলেই আপনাকে সেই খাবার দিতে পারব।

সন্ন্যাসী অবাক্ হয়ে ধুনী জ্বালানোর কাঠ বের করে আগুন জ্বালালেন। দাউ দাউ করে যখন আগুন জ্বলে উঠল তখন খরগোশ বলল—দেখুন, আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, বেশী কিছু দেবার সামর্থ্য তো আমার নেই। আমি আহার করি মিষ্ট তৃণ, কিন্তু তা তো আপনার ভক্ষ্য নয়। তাই আমার সামর্থ্যে যা কুলায় আমি তাই করছি। আমি এই আগুনে পুড়ে দেহত্যাগ করছি, আপনি দয়া করে আমার মাংস আহার করে ক্ষুধা নিবৃত্ত করুন। বলেই খরগোশ অগ্নিকুণ্ডে লাফিয়ে পড়ল।

খরগোশ অগ্নিকুণ্ডে লাফিয়ে পড়ল।

কিন্তু কি আশ্চর্য! তার দেহ তো পুড়ল না! এমন কি সামান্য আগুনের আঁচ পর্যন্ত তার দেহ স্পর্শ করল না। বিধি কি আজ এতই বিরূপ যে সামান্য অতিথি সৎকারের পুণ্যটুকুও তাকে অর্জন করতে দেবেন না। গভীর দুঃখে সে কেঁদে ফেলল।

এমন সময় সাধুপুরুষের চেহারা হঠাৎ বদলে গেল। ধীরে ধীরে প্রকাশিত হলেন দেবরাজ ইন্দ্র। তারপর খরগোশকে বললেন—ওগো সাধু খরগোশ, বেরিয়ে এস তুমি অগ্নিকুণ্ড হতে। আমি দেবগণের রাজা। তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য এসেছিলাম। তোমার বন্ধু তিনটি ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু বিস্মিত হয়েছি তোমার কার্যে। জগতে নিজের প্রাণ দিয়ে অতিথি-সেবা বোধ হয় কেউ করেনি। তোমার এই অপূর্ব অতিথি সৎকার যাতে জগৎবাসী জানতে পারে তার ব্যবস্থা করছি।—বলে শূন্যে উঠে গেলেন তিনি। আকাশের গায়ে পূর্ণচন্দ্র তখন বিস্মিত হয়ে এদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছিল। ধীরে ধীরে তার কাছে উপস্থিত হয়ে চন্দ্রের দেহে খোদাই করে দিলেন খরগোশের মূর্তি।

হাঁদা-ভোঁদার

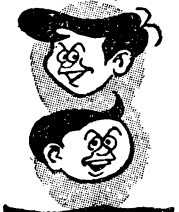

চুণকাম

কি করছিস রে ভোঁদা?
এ দেয়ালটায় দাগ ধরেছে বলে পিসেমশাই চুণ লাগাতে বলে গ্যাছেন!

দেওয়ালের সঙ্গে তোর নিজেরও চুণকাম দরকার রে ভোঁদা!

ওপস্!
হিঃ হিঃ!

ভোঁদা বাগান পেরিয়ে তেড়ে আসছে। আমি ঐ মালির ঘরটায় গিয়ে লুকোই!

হোজপাইপ দিয়ে জল ছিটিয়ে তোর চুণকাম সাফা করে দিলুম!
আগ্‌লগ্

ঘরের ভেতর জল ঢুকিয়ে হতচ্ছাড়াটাকে নাকানিচোবানি খাওয়াবো!

পাইপে গোঁট দিয়ে দিলুম। এবার ভোঁদা কিছুই করতে পারবে না।
এবার কলটা খুলে দিয়ে ঘরে জল ঢুকিয়ে শয়তানটাকে— ওয়াপ!
হিঃ হিঃ!
হতভাগা উলটে আবার আমাকেই চোবালো! যাক্ আমার গায়ের চুণ সাফ হয়ে গেছে।
পায়ের ছাপ দেখছি সামনের ঘর পর্যন্ত গেছে!
ওয়! হাঁদা এখানে— বেরিয়ে আয়! আমি তোকে আমার কার্পেটটা দেখাতে চাই!
কোন কৈফিয়ৎ শুনতে চাই না! তুই যে ঘরে ছিলি পায়ের ছাপ সেই পর্যন্ত গেছে— তার মানে তোরই কাজ!
হোঃ হোঃ! বেশ মনযোগ দিয়ে সাফ কর হাঁদা! পিসেমশাইকে বেশ উগ্র বলে মনে হচ্ছে!
গররর!

জীবনদান

এটি একটি ছোট্ট নকশালের কাহিনী। ডাক্তার, নার্স, হাসপাতালের লোকেদের কাছে সে "ক্ষুদে নকশাল" বলেই পরিচিত। কারণ তাকে পাওয়া গিয়েছিল উত্তর বাংলার নকশালবাড়ির এক কোণায়। ছোট্ট গণেশের কাহিনী এক অপূর্ব জীবন-মৃত্যু সংগ্রামের কাহিনী। আজ গণেশ সেই নকশালবাড়ির আদিবাসী শিশুদের রোগজীর্ণ, নিরাশাময় জীবনে আশার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত বছর ১০ই মে ইউনিসেফের লোকেরা (সংযুক্ত রাষ্ট্র শিশুকোষ) নকশালবাড়ির জন-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যখন যায়, হঠাৎ তাদের চোখে পড়ে একটি রোগজীর্ণ, কঙ্কালসার শিশু। ইউনিসেফের লোকেরা তখন উত্তর বাংলায় একটি বিশেষ রিলিফ প্রোগ্রামের কাজ করছে। তারা জিজ্ঞেস করতে ডাক্তাররা বললেন যে, বাচ্চাটির বাঁচার কোন আশা নেই। প্রচণ্ড অপুষ্টিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে সে তখন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে।

আরও খোঁজ নিতে জানা গেল যে, বয়স তার মাত্র তিন বছর। এক বিশ বছরের আদিবাসী বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। কিন্তু ডাক্তারদের আর তখন করবার বিশেষ কিছু নেই।

গণেশকে জলপাইগুড়ির নিউট্রিশন থেরাপী কেন্দ্রে পাঠাতে রাজী কিনা জিজ্ঞেস করায়, বিধবা মায়ের চোখে যেন কিছু আশার আলো দেখা গেল। কিন্তু তার বাড়ির বড়দের অনুমতি চাই।

দুদিন পর আবার ইউনিসেফের লোকেরা ফিরে এল। ডাক্তাররা আশা ত ছেড়েই দিয়েছে, দেখাই যাক না একবার শেষ চেষ্টা করে। গণেশের বাড়ির লোকেরা তাই ভেবেই অনুমতি দিল এবং গণেশের মা আশা-নিরাশায় দুলতে দুলতে ছোট্ট গণেশকে বুকে নিয়ে জলপাইগুড়ি চলল।

তাদের পৌছানর সাথে সাথেই জলপাইগুড়ির সরকারি হাসপাতালে যে বিশেষ পৌষ্টিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে, সেখানে গণেশকে ভর্তি করা হল। এই কেন্দ্রে বিশেষ করে এইরকম অপুষ্টি-জনিত রোগেরই চিকিৎসা করা হয়। হাস-পাতালের ডাক্তার দাশগুপ্তর তখন আরম্ভ হল এক অপূর্ব সংগ্রাম—একটি ছোট্ট দেহে জীবনের সঞ্চার করা।

১৭ই মে আবার ইউনিসেফের লোকেরা জলপাইগুড়ি এল গণেশের খোঁজ নিতে। কি হল দেখাই যাক। যদিও ডাক্তারদের মতে গণেশের ফুসফুসটি ক্ষয় রোগে ঝাঁঝরা, আর কম সে কম আর দুইমাস হাসপাতালে থাকা প্রয়োজন, ইউনিসেফের লোকেরা কিন্তু এই কয়দিনেই গণেশের চেহারায়

একটা পার্থক্য দেখল। মার চোখেও কিছু কিছু আশার আলো দেখা যাচ্ছে।

ইউনিসেফের তরফ থেকে তখন মিঃ জ্যাকবকে বলা হল গণেশের প্রতি লক্ষ্য রাখতে। ২৩শে মে জানা গেল গণেশের অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে।

ডাক্তার দাশগুপ্তর তখন রোখ চেপে গেছে—গণেশকে বাঁচাতেই হবে। আর তার ক্ষুদে জীবনীশক্তি নিয়ে গণেশও লড়ে যাচ্ছে—যদিও তার ডান ফুসফুসটি একেবারে ঝাঁঝরা। ক্ষয়-রোগের চিকিৎসা আর পৌষ্টিক চিকিৎসায় দেখা গেল, জুলাইর শেষে ছেলের ওজন হয়েছে নয় কিলোগ্রাম। যখন তাকে মে মাসে ভর্তি করা হয় তখন তার ওজন ছিল মাত্র সাত কিলোগ্রাম। ওঠা-বসারও তখন তার ক্ষমতা ছিল না। আগস্ট মাসে দেখা গেল গণেশের প্রচণ্ড ক্ষিদে হয়েছে—আর ওজন পৌঁচেছে দশ কিলোগ্র।

হঠাৎ দেখা গেল গণেশের পেট থেকে গোল গোল কৃমি পোকা বার হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ পড়ায় তার পেট আর হজমশক্তি বাঁচান গেল। ইতিমধ্যে এক্সরে করতে দেখা গেল যে, তার ফুস-ফুসও ক্ষয়রোগের বীজাণু থেকে মুক্ত হয়ে আসছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর এল হাসপাতাল ছাড়ার দিন। এক নতুন গণেশ চলল বাড়ি। বিধবা মায়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। এ এক অলৌকিক পরিবর্তন

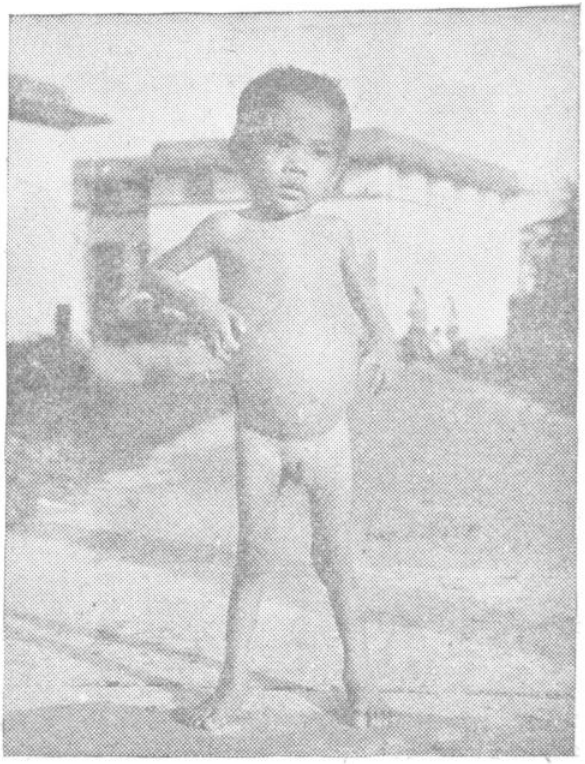

হাড়-সর্বস্ব ছেলের মধ্যে। গাঁয়ের লোকেরা ত তাদের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারে না। গণেশ এখন কিছুদিন বিশেষ নিউট্রিশন প্রোগ্রামের চিকিৎসায় থাকবে। ইউনিসেফের চেষ্টা, ডাক্তারদের অপূর্ব শ্রম, গণেশের জীবন ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু উত্তর বাংলায়, সারা দেশে এখনও বহু গণেশ আছে।

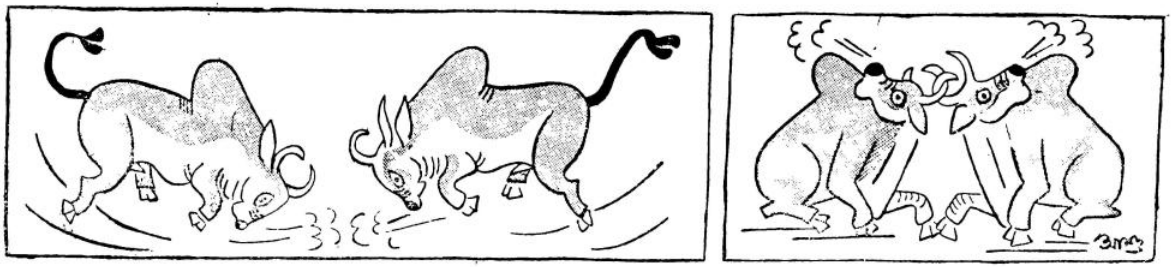

মেজাজ গরম দুভাইতে করছে লড়াই আজ,
ফলটা পেল বন্দী হয়ে নেইকো আর কাজ।

নতুন ধাঁধা

১। পশু আমি। নহি দানব
অথবা মানব।
বল তো কে আমি ?

—সেণ্ট রিয়া, মুরারই।

২। জল দল বলে,
ভাগ্যে কি যে ফলে।

—রুবেন কর গুপ্ত, জামসেদপুর-৫।

৩। পাখির আগে পাখির শির,
নাম কি বল প্রাণীটির।

—বিদিশা ও বৈশালী দাস, ডিসেরগড়।

গত আষাঢ় সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। মোরগ ২। পানামা ৩। খড়ম

গত আষাঢ় সংখ্যার ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—ডলি, লিলি, সনৎ, বাপ্পা ও মুন্না—দমদম; জামাইবাবু, কণাদি ও সুবল—কাঁকুলিয়া রোড; সুমন, পাপন ও অঞ্জন—পিকনিক গার্ডেন; শৌর্যশেখর দেব—রামকৃষ্ণ ঘোষ রোড; সত্য, প্রভঞ্জন ও হেমন্ত—পাটোয়ারবাগান লেন; দেবাশীষ, চন্দন, রূপালী ও শ্যামলী—বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট; আলোকরঞ্জন সরকার—পাটোয়ারবাগান লেন; বুড়া বাবু, পাংকি, গাটকুন ও বাণ্টি সোম—গাঙ্গুলীবাগান; শর্মিষ্ঠা, সুস্মিতা ও শাশ্বতা শীল—গোবরা রোড; দিদিমা, গবুমামা, বাদলদা, অলক ও সুমিত—লেক গার্ডেন্স; অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, প্রসেনজিৎ ও অরিজিৎ দত্ত—ঢাকুরিয়া; মা, দীপু, শীলা, হাসি, খুকু ও তাপস—বকুলবাগান রোড; সুবোধ, রামু, বিশু ও পংকা—মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল; তপন, তরুণ, সোনালী ও রূপালী রায়—কাশীবাজার টুকটুক, রাজাবাবু, রেখারানী ও রবীন্দ্রনাথ বৈদ্য গরফা মেন রোড; ভাস্বতী, কস্তুরী ও প্রবীর—রাষ্ট্রগুরু অ্যাভেনিউ; অমিত অতীন ও অজন্তা রায়চৌধুরী—পূর্ব সিঁথি রোড; বুড়ু ও অপু—মাতৃমন্দির লেন; মনোজ, কাজল ও সঞ্জল—খেলাতবাবু লেন; বাবা, মা, সত্যজিৎ, দেবজিৎ ও সুরজিৎ দে—বাগমারী; সুবলমামা, বুবু, শম্পা, বাপি ও ভোতা—কাঁকুলিয়া রোড; পম্পা, টুম্পা, দীপা, দেবু ও মা—পাইকপাড়া; শুভশ্রী, রমা, বিন্দু ও মৌমিতা—আরপুলি লেন; পরিমল, রেণুকা ও বাবুম পাল—দত্তবাগান; মিতালী, সুস্মিতা, কল্পনা, আইভি ও বুলু—রাজা মণীন্দ্র রোড; বাবুল ও পম্পা—বিবেকানন্দ রোড; সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—সেবক বৈদ্য স্ট্রীট; দেবপ্রসন্ন ও দীপঙ্করপ্রসন্ন রায়—গোরাচাঁদ বসু রোড; মা, বাবা, বাবুন, খোকন ও বাচ্চু—মেহের কলোনী; তাপস, তপন বাবা, মা, ছন্দা ও নন্দা আচার্য—রবীন্দ্রনগর; স্বাতী, অভিজিৎ বাচ্চু, মা ও বাবা—দমদম রোড; শান্তনু, সুদেষ্ণা, মা ও বাবা—পি. এম. রায় রোড; অসীম, অমিত ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন; নীলাঞ্জনা ও দীপঙ্কর সান্যাল—বনমালী নস্কর রোড; অমিতাভ, গৌতম, পার্থ ও কল্যাণী ভট্টাচার্য—কালীঘাট রোড; বাবা, মা, কাকু, গৌতম উত্তম প্রভৃতি—অধরচন্দ্র দাস লেন; রঞ্জিত, মিহির, অতুল, প্রণব ও তপন—দেশবন্ধু হোস্টেল; ভাস্বতী, শাশ্বতী, স্বাতী ও সংহতি—লেক টাউন; রিংকু, পিংকু, টিংকু ও সঞ্জয়—নারায়ণ রায় রোড; মামণি, ছোটদা, সান্ত্বনা, পুতুল, রত্না প্রভৃতি—বকুলবাগান রোড; জয় ও মা—নিবেদিতা লেন; রাজা, জয়, শুভা, চেন্টি ও অঞ্জলি—উল্টাডাঙ্গা মেন রোড; ভোলা, ঝিলু মকাই, বাবুলি ও মঞ্জু—চারু অ্যাভেনিউ; স্বাতী ও দ্বৈপায়ন দত্ত—রাণী হর্ষমুখী রোড; বাপী, মা, বাবা বাবু প্রভৃতি—বেহালা; সত্যেন্দ্র, সুশান্ত প্রশান্ত, নীলিমা ও অনিমা দাস—অশ্বিনীনগর; বাবুয়া, বুকু, মিলকু, পারু ও মিঠু ধর—বাঙ্গুর অ্যাভেনিউ; বাচ্চু, বুবাই, কৃষ্ণা, শ্যামল, রাজা প্রভৃতি—বাবুবাজার; সমীরণ, সঙ্গীতা, অমল ও সুকুমার রায়—গরচা ফার্স্ট লেন; টুটু ও বাবু—সরশুনা; সুপ্রিয় ও সুপ্রতিম চন্দ—যাদবপুর; অরূপ অনুপ, অলক, শ্রীবাস ও টুম্পা—মিণ্টন স্ট্রীট; সোনালী, কাকলী ও ইলা বসু—বেহালা; গদাই, ফুচি, বাবু ও বুটি—পর্ণশ্রী পল্লী; মদনমোহন ও ভারতী সরকার—কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট; অনিমা সরকার—পটলডাঙ্গা স্ট্রীট; প্রীতিন, বিটু, রামা প্রভৃতি—

পটোয়ারবাগান লেন ; ভানা, মিষ্টু ও টুবলুন রাহা—পূর্ব সিঁথি রোড ; সুজয়, জয়ন্তী ও অভীশ বেতাল—নবীন ঘোষাল রোড : বুবুন, পাপু, পাপু ও বাপী—কে সি. ঘোষ রোড : টুটুন, বুবুন ও ববি—গোপালচন্দ্র বোস লেন : বাবলি, কাকলি ও সোনালী—পূর্ব সিঁথি রোড ; প্রশান্ত, তির্থক ও অসীম—মোহনলাল স্ট্রীট ; গৌতম, ঝুমা, দোমা, টুম্পা প্রভৃতি—পোর্ট হসপিটাল পার্ক ; টিটু, পিংকু, তুতুন, তাতা প্রভৃতি—দমদম।

২৪ পরগণা—চন্দন, রাজা, কালা ও মামীমা—হাবড়া ; তাপসী ভট্টাচার্য—নৈহাটী ; বুজি, টিগলু, টুকুন, বুবাই ও টুনাই—ভাটপাড়া ; স্বপনকুমার, কল্যাণ, শোভা, মৃত্যুঞ্জয়, বাসুদেব প্রভৃতি—বঙ্গনগর, রঞ্জু, রিংকু, বাবা ও মা—বারাসত ; অঞ্জনা, মঞ্জু ও টিংকু—বারাসত ; সুজিত ভট্টাচার্য ও মা—হালিশহর : উমা, ঘণ্টু ও টুস্কি দত্ত—গরিফা ; অমিত, সুমিত, বরুণা ও তথাগত ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া : মৌসুমী, চৈতালী, পার্থ, মিতালী ও পিয়ালী বসু বারাসত ; দেবু, টুসকি, রিমি ও মামু—দেউলপাড়া : শাহাজাহান উদ্দিন আমেদ—দোমাগর ; লিপি, পার্থসারথি, দেবাশীষ ও শুভাশীষ গুপ্ত—নৈহাটী : অপর্বকৃষ্ণ দাস—তিলকচন্দ্রপুর : কাজল, লালু, রিকু প্রভৃতি—ভাটপাড়া ; দেবযানী, শর্বরী, পার্থ, শর্মিলা, সোমা প্রভৃতি—ভাটপাড়া ; দেবকুমার, শিখা ও তাপস বিশ্বাস—গড়িয়া · কাকলি, পল্লব, সাধনা ও কল্লোল ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া : আবীর ভট্টাচার্য ও মা—বারাকপুর · পকাই, বাবু মামু অমু প্রভৃতি—রহড়া : বেচু চাঁদু, মালা, বজু ইত্যাদি—ভাটপাড়া : সুমনা, ইলা ও অমল সেন—দত্তপুকুর : কৃষ্ণা কাবেরী বাচ্চি মিঠু ও ডলি ঘোষ—উদয়রামপুর ; মা, বাসু, জয়া মকু, স্বপ্না প্রভৃতি বারাকপুর : বাবা রতন, তপন স্বপন রেখা প্রভৃতি—বারাকপুর ; রাণু, রুমু গৌতম জ্যোতি প্রভৃতি—সাহেববাগান ; রিংকু, নোটন, মা ও বাবা—গোপালপুর : বরুণ, মাণিক, সমীর ও শাকা মুখার্জী—ভাটপাড়া : সন্দীপন গোস্বামী—হাবড়া : স্বপন, গোপাল, রবীন, তরুণ, অঞ্জনা, অর্চনা ও পূনা মণ্ডল—বকড়, বসু, বুড়ি ও শঙ্করী—নৈহাটী : সুলোক প্রবীর, উদয় ও অরূপকুমার আদক—গোস্তসাগাট কৃষ্ণপুর : অসিতবরণ পাল ও শান্তিময় হাজারী—আমতলা : বন্দনা, জয়শ্রী, তাইয়া ও ত্রিলোচন ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া ; তাপস, পতুল, বুকু চাটার্জী—শহীদনগর : অনিন্দা ব্যানার্জী—পানিহাটী বাবলু, বাবু ছোটিক, গদাই ও ফুচি—সরকারপুল ; মা, মণিকা, রীণা জয়ন্ত ও কেয়া ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া : সুকান্ত সুশান্ত, সুপর্ণা সুপ্রিয় প্রভৃতি—কাঁচড়াপাড়া বাবুয়া মিলু, পটলা, মা ও বাবা সরকারপুল : মোহন্ত আনন্দ মিনতি, শম্ভু ও আলোক—গোপালপুর।

হাওড়া—সন্দীপ, মিতালী ও সুতপা—শালিমার হেমন্ত, কেশব, অমর, মহামায়া, রীতা ও নাড়দা—তেঁতুলকুলী সনিতা, শিপ্রা, রণজিৎ ও রামু—হাওড়া—৩ ; ন'দা, সঞ্জিত ও সুজিত দাসভৌমিক—বেলগাছিয়া অলককুমার দত্ত—ইছাপুর : চিত্ত বিউটি ও মানস সোম—ইছাপুর : অরুন্ধতী, অনসূয়া, অনুরাধা প্রভৃতি—রামরাজাতলা ; তাপস ও মানস ব্যানার্জী—শিবপুর : ইন্দ্রনীল, নভোনীল, বাবা, মা ও পুপু—শিবপুর রোড ; সরোজ, সোনালী, অমর, শান্তনু ও সোমা—সাঁতরাগাছি : দেবজিৎ মুখার্জী ও গীতা ব্যানার্জী—শিবপুর : অনিমা, তপতী, শ্যামলী ও বিশ্বজিৎ পাইন—শালকিয়া : বুগাই, নৌটন, মা, বাপি প্রভৃতি—হাওড়া : দোলা, রাজা, তনু, কাকলি ও বাবুয়া—কৃষ্ণধন কর লেন : শৈবাল, প্রবাল, তমাল ও সুজয়—বালিটিকরী ; প্রণব, সন্ধ্যা ও শ্যামলী মণ্ডল—তেঁতুলকুলী ; বন্দনা, বাচ্চ, মিতা, সাধন ও সুস্মি—চেঙ্গাইল ; সুস্মিতা ও অদিতি—পঞ্চাননতলা।

হুগলী—শুভ্রা দাস—চন্দননগর ; মা, নূপুর, পুতুল, বিমান ও চন্দন—কোন্নগর ; কৃষ্ণা, মিলি, জনা, সুতপা ও বু—চুঁচুড়া ; টুলটুল, বুলবুল, শ্যামল, আশীষ ও দেবাশীষ—জনাই ; দাদা, বৌদি ও ফটিক—শ্রীরামপুর ; পার্থ, ছোট্টু, রীতা ও অমিত কুণ্ডু—ব্যাণ্ডেল ; মিতা, ঝুমু, টুকুন ও টিংকু—চুঁচুড়া ; সমীর, ছন্দা ও সীমা বসু—বৈদ্যবাটী ; বুলা অঞ্জনা, বাবি, চয়ন, তুতুন ও বাবুটা—জনাই চঞ্চল, নন্দিনী, পদ্মিনী, ননী ও ভানু—বৈঁচীগ্রাম, দাদুভাই, বড়দি, দাদাভাই ও শম্পা দে—চুঁচুড়া ; মা, বাবা, সুতপা ও সুজাতা দে—চুঁচুড়া ; কণিকা, গৌতম, মণিকা, মোম ও মেরী বর্মন—উত্তরপাড়া অমলেশ মুখার্জী ও অঞ্জনা মুখার্জী—বাক্‌সা ; শুভঙ্কর চৌধুরী—বৈঁচীগ্রাম : মঞ্জু, মলু, শিখা, শীলা, বুদো, অশোক ও খোকন—কলাছড়া ; কুমু, ঝুমু, বাবু, তুলু, পালু, চালু ও বাবি—শ্রীরামপুর ; বুজা, বাপি, মনা, বুলু, মা ও বাবা—ব্যাণ্ডেল ; সুমিতা, সুস্মিতা, সুজাতা, বিশ্বজিৎ, মা ও বাবা—ইটাচুনা।

নদীয়া—মনোজ চৌধুরী—রাণাঘাট : গীতপ্রিয়, জ্ঞানপ্রিয়, চিত্রা ও গয়ানাথ—আড়ংঘাটা ; দেবাশীষ, দেবব্রত, দেবিকা, অতীশ ও অমিত—চাকদহ ; দেবদত্ত, ডালিয়া, মহুয়া, কানাই ও অর্চনা চট্টোপাধ্যায়—কৃষ্ণনগর ; শুভময় সাহা—কৃষ্ণনগর ; রতন, স্বপন ও মিতা—চাকদহ

বর্ধমান—কমল, বিমল, মিলি, পাপড়ি ও চম্পা—বার্নপুর ; মা, বাবা, দাদা, বৌদি ও ছোটন—কুলটী : মনী, নন্দ, উত্তম ও কাবেরী—কুলটী : রতন, কাজল ও কানন—বেনাচী : শৈলেন্দ্র, শুভাশীষ, সত্যব্রত, তাপস ও প্রসেনজিৎ—বার্নপুর : ফুলটুসী, বন্দনা ও মিতা—বার্নপুর : প্রণব, স্বপন, তারাপদ, মাণিক, বনানী প্রভৃতি—বার্নপুর ; অরূপ, অনুপ, শোভনা ও কমল সেন—ভানোড়া কলিয়ারী : শান্তি, শীতল, হবি, রাণু, লক্ষ্মী, ভারতী প্রভৃতি—মহিশীলা : বিল্টু, বাবুলি, বড়বাবু, টুকু, বুকু প্রভৃতি—বার্নপুর ; বাবুয়া, গদাই ও বিচ্চু—বার্নপুর ; রীতা, মিতা, অরূপ, প্রণব ও সলিল বসাক—বর্ধমান ; পামেলা, সীমা, রীণা, তৃপ্তি, কুমকুম ও বাবা—বার্নপুর : প্রসূন, দীপান্বিতা, প্রতীক প্রভৃতি—বল্লভপুর ; অনুপ ও জলি পালিত—বার্নপুর ; রীজা ব্যানার্জী ও বৃত্তি রায়—বার্নপুর ; বসুধা, বরুণা, শ্যামল ও রূপম রায়—আসানসোল ; নেণ্টু, মণ্টু গোপা, টুকুন রুপুন, কান্টু ইত্যাদি—আসানসোল ; দিদি, জামাইবাবু, মাধবী, মালবিকা মনসা প্রভৃতি—অণ্ডাল ; গোরা মিতু, রুবী, টিংকু, বুবাই প্রভৃতি—দুর্গাপুর জয়দীপ, রীতা, মা ও কাকা—রানীগঞ্জ ; তনু, বউ বনমালী ও অনিল—দুর্গাপুর-৯ ; শংকর, শ্যামল ও সুজাতা মাহাতো—গোপালমাঠ : সরোজ, মনোজ, সুব্রত, কৃষ্ণা, বেবী প্রভৃতি—গোপালমাঠ ; কার্তিক, গণেশ, দীনেশ ও রেণুকা সেন—সেহারা · বিষ্ণুপদ, চিত্রা, ইন্দ্রনীল ও নন্দিনী রায়—আসানসোল : বড়দা, মেজদা, মিঠু, খুকু, ঝুমু প্রভৃতি—বীরহাটা ; গুরুপ্রসাদ, দেবদাস ও রামপদ—ভিরাট ; শম্পা, সুমন্ত ও সাগরিকা মিশ্র—কালিবাজার ; সন্তদাস বটব্যাল—কালীপাহাড়ী মা, বাবা, নীলাঞ্জন ও তথাগত গঙ্গোপাধ্যায়—বর্ধমান ; মাধব, জিতেন্দ্র ও লক্ষ্মী—কামারপাড়া : গৌতম, মুন্না, রানা, সোনা ও রিঙ্কু—বার্নপুর ইতু, কাজল, কেকা, বিমু, পাপা ও রেণু ঘোষ—বর্ধমান ; সুবীর, সুশান্ত, বাবা, মা, জীবন প্রভৃতি—বর্ধমান ; ইন্দ্রাশীষ ও দেবাশীস ঘোষ—দুর্গাপুর-৯ ; তন্ময়, শর্মিলা ও মাস্টারমশাই, মিঠু, দুর্গা, মোহন, চিত্রা ও প্রীতম—বার্নপুর ; বাণী, তাপু, তনুশ্রী ও অনুশ্রী ঘোষ—বার্নপুর ; ঝর্ণা, আলো, বাবু, নির্ঝর, কৃষ্ণা প্রভৃতি—দুর্গাপুর ; তারাপদ, সন্তোষ, রাণা, মা ও বাবা—রানীগঞ্জ ; টুনা গোপাল ও রাখাল—চিত্তরঞ্জন ; তারা, কালিদাস, মামণি, বাবা, বৌদি প্রভৃতি—রানীগঞ্জ ; বিকাশ, প্রণব, ঝুণু, ভারতী ও পবিত্র—রানীগঞ্জ ; মালমিতা, মৌসুমী ও দেবাশীষ আচার্য—দুর্গাপুর-৬ ; পরিতোষ, যামিনী, সুতপা, মা, বাবা, ক্ষুদিরাম

প্রভৃতি—দুর্গাপুর-৫ ; বিশ্বজিৎ, অভিজিৎ ও প্রসেনজিৎ চৌধুরী—আসানসোল ; শর্মিলা, ববি, বুনু, টিটো প্রভৃতি—আসানসোল ; নিশিকান্ত, তুষারকান্ত, অনুপম ও পুরুষোত্তম—কামারপাড়া ; ভবানী-প্রসাদ ও বাসন্তী কর্মকার—দুর্গাপুর-১৩ ; ছোটকাকু, পানু, সোমা, দীপা প্রভৃতি—কালনা ; দুগাইমামা, জামাইবাবু, শ্যামল, রাধারানী ও তাপস—তিরাট ; ছবি, কালু, লুলু ও ভুলু সেন—চিত্তরঞ্জন ; দাদা, বৌদি, দিলীপ, শেখর, মধুমতা প্রভৃতি—ছোটদিঘারী ; বাবা, মা, দেবু, সুবীর, রূপালী ও শ্বেতা—বার্নপুর ; বাবা, মা, মিতু, শান্তনু ও অতনু দাশগুপ্ত—সাঁতা ; দিঘারী সব পেয়েছির আসরের সভ্যবৃন্দ—ছোট দিঘারী ; কল্যাণী ও রুচিরা—সাঁতা ; বীরেন, জীতেন, রবি, সোনামণি ও মানু—কুনুস্তোরিয়া ; প্রকাশ, চন্দ্রশেখর ও বিশ্বনাথ—বার্নপুর ; আলো সেনগুপ্তা, মা এবং ভাইরা—বার্নপুর ; চুমকী, গোপা, কুহু, লাল্টু, পল্টু প্রভৃতি—অণ্ডাল ; বেলা, রবীন, বুলু, পম্পা প্রভৃতি—লালগঞ্জ ; রুণু ও সুবীর—চিত্তরঞ্জন ; বুবুদা, অজয়, মিলন, সমীর প্রভৃতি—ছোট দিঘারী ; শবরী, বুম্বা, খোকন, টোটন ও শঙ্করী—দুর্গাপুর-৫ ; অমিত ও শিপ্রা রায়—খরা ; বিশ্বনাথ, গৌতম, বুম্বা, ভোলানাথ ইত্যাদি—বার্নপুর ; তাপু—দুর্গাপুর-৪ ; ফাল্গুনী, কৃষ্ণা, পাপু, কেয়া ও ছোটমামা—দুর্গাপুর-১০ ; ভাস্বতী, নন্দু, বুবাই, টুকাই প্রভৃতি—রূপনারায়ণপুর ; বাবু, শেখর, রুবি, পিংকু ও খোকা—আসানসোল ; পার্থ, গোপালদা ও সুবল রায়—ছোট দিঘারী ; মধু, মনু, পম, টুনু প্রভৃতি -কাটোয়া ; নীলাঞ্জন, মহুয়া ও সন্ধ্যা—দুর্গাপুর ; সুকুমার, রামপ্রসাদ, অশোক, প্রভাত, পার্বতী ও প্রভাংশু—বর্ধমান ; কল্লোল, কেয়া, সোমা ও অশোকদা—শীতলপুর কলিয়ারী ; কানুমামা, তপতী, প্রণতি, স্বপন ও অমলেন্দু মুখার্জী—বার্নপুর ; পিন্টু, সিন্টু, নান্টু প্রভৃতি—দুর্গাপুর-১৩ ; সব্যসাচী, শর্বরী, প্রদীপ, দয়াময়দা ও মা—আসানসোল ; রীনা, রত্না, মিঠু ও বাণ্টি—আসানসোল ; রীতা, ঝর্ণা ও বাপী চৌধুরী—দুর্গাপুর-৬ ; অশোকমণ্ডল চট্টোপাধ্যায়—রানীগঞ্জ ; তুষার চক্রবর্তী—মেমারী ; সৌমিত্র, উত্তম, গৌতম, আশীষ প্রভৃতি—রানীগঞ্জ।

মুর্শিদাবাদ—অরিজিৎ দত্ত—বহরমপুর ; শুভাশীষ, প্রেমাশীষ ও ধ্রুবজ্যোতি বরাট—বহরমপুর।

বাঁকুড়া—শ্যামল, অসিত ও বিনয়—সোনামুখী ; সমীরণ, নিশীথ ও মাধব—মটুকবনী ; মা, মীরা ও জগন্নাথ রায়—উখরাডিহি ; পরিতোষ, সীমন্ত, হেমন্ত, অনাথবন্ধু ও নিখিল মণ্ডল—মটুকবনী ; শুভ্রাংশু, সুধাংশু, হিমাংশু, সিতাংশু প্রভৃতি—মটুকবনী ; পরিমল, শ্যামল, শীতল ও সরল গঙ্গোপাধ্যায়—মটুকবনী ; প্রবীর, নিমাই, নিরঞ্জন ও পতিত—প্রতাপবাগান ; মা, বাবা, সব্যসাচী, সন্দীপন ও তথাগত চট্টোপাধ্যায়—মালিয়াড়া ; বাবুলাল, মঙ্গল, শংকর, অমূল্য প্রভৃতি—উখরাডিহি ; ভৈরব মণ্ডল ও বাবলু সাহা—সোনামুখী ; প্রগতি সংঘের সভ্যবৃন্দ—সোনামুখী ; পার্থ, শ্রীরাজকুমার, নিশীথ, গৌতম ও নিরঞ্জন—কেন্দুয়াডিহি ; কাবেরী, মুন্নি, কৃষ্ণা, রীতা, কাকলি ও মা—কোতলপুর ; দীপু, রাণু, তনু, মনু প্রভৃতি—সোনামুখী ; বনি ও টুকু চৌধুরী লাখেশোল ; টিম্পু, বাচ্ছি, ভাই, মা, বাবা প্রভৃতি—বাঁকুড়া ; সত্যনারায়ণ, শুভাশীষ ও আশীষ গাঙ্গুলী—রাউতোড়া ; বিশ্বজিৎ ও মহুয়া পাল—কুশদ্বীপ ; রুবী, ববী, সন্দীপ ও সুব্রত রায়—রবীন্দ্র-সরণি ; তাপস, ভোলানাথ, মিঠু প্রভৃতি—বাঁকুড়া ; জয়ন্ত, মৃণাল, সন্ধ্যা ও নারায়ণ সূত্রধর—সোনামুখী ; কার্তিকচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিসাধন মুখোপাধ্যায়—সোনামুখী ; বাবু, বেলা, তপন ও মলয়া—সোনামুখী ; পুতু, টুকু, টুলু, বাচ্চু, বিচ্ছু প্রভৃতি—কোয়ালপাড়া ; রুমা, দীপ, বাবা, মুনমুন প্রভৃতি—মালপাড়া ; চানু, সুশীল, মানসী, শ্যামল প্রভৃতি—মালপাড়া ; আশিষ, শুভাশীষ ও গাবু গাঙ্গুলী—বামুনতোড় ; ঝুনু, পিনু ও রমেশ গঙ্গোপাধ্যায়—বামুনতোড় দেবাশিস, প্রবীর, প্রশান্ত, কাকলি, বুড়িয়া প্রভৃতি—দেগুরিয়া ; শুভ্র, আলোক ও বিধান গাঙ্গুলী—রাউতোড়া ; সুনীতি, সুপ্রীতি, শিউলী, মিতা প্রভৃতি—রামপুর ; মণি, মুক্তা ও জহর গাঙ্গুলী—বামুনতোড়া ; নিবাস, মুক্তি ও উৎপল গাঙ্গুলী—রাউতোড়া ; বিশ্বনাথ, মাণিক, শান্তনু ও তপন—সোনামুখী ; প্রদীপ কর্মকার—দেগুড়িয়া ; বুবুন, লালটু, মৌ, বাবাই প্রভৃতি—অমরকানন ; সোনাবৌদি, শম্পা, শঙ্কু, ঝঙ্কু ও উত্তমকুমার বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; প্রতিমা ও মাণিকলাল ধীবর—সোনামুখী ; শৈলেন, দিলীপ, কল্যাণ ও তুষারকান্তি সিংহ—ভৈরবপুর ; টুটু, টুম্পা, নানা, মা ও বাবা—লোকপুর ; জীবনকুমার দে—আকুই ; সৌম্যেন্দ্র, মৌমিত্র ও শিলাদিত্য—মালপাড়া ; মা, দাদা, বৌদি, ক্ষমাবৌদি, দ্বিজদাস ও সন্তদাস বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; রূপালী, শিউলি, মৌসুমী, প্রদীপ, সুদীপ ও সন্দীপ বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; নিশাপতি, অবনী, মৃত্যুঞ্জয়, নরেন ও সুযেন দে—সোনামুখী ; স্বপন, নিখিল, প্রদীপ ও তুষার—সোনামুখী ; জলি, বাবু, সুপু ও মুন্না—বাঁকুড়া ; দক্ষিণেশ্বর, মুক্তালাল, সুদর্শন, দিলীপ, সুখময় প্রভৃতি—স্কুল-ডাঙ্গা ; সুধাংশু, সুনীল, সুকুমার, অঞ্জন, ফটিক প্রভৃতি—সোনামুখী ; কৃতীশেখর, পীযূষ, পাঞ্চালী, পিন্টুদি, মিন্টুদি প্রভৃতি—অমরকানন ; ছন্দু, বিকু, বন্টু, বাপী, বাবল ও ময়না—সোনামুখী ; স্বরাজ, বিকাশ, তপন, প্রদীপ প্রভৃতি—সোনামুখী ; বিপুলবিহারী সিন্হা—বাঁকুড়া ; বাবা, মা, পৌষালী, চৈতালী ও দেবাশীষ মিত্র—বাঁকুড়া ; সমরেন্দ্র, প্রদীপ, হরি, দয়াদা প্রভৃতি—অমরকানন ; তপন, স্বপন, বিধান, বাপ্পা ও বিউটি চ্যাটার্জী—ভক্তাবাঁধ ; ভূতনাথ, মন্টু ও শ্রীকুমার—অমরকানন ; অনুপম, মীনা, কল্পনা ও সুনীতা—ভৈরবপুর ; লীলা, মীরা, সদাব্রত ও বাবলু—মাণ্ডি ; শম্ভুনাথ সিংহ—ভক্তাবাঁধ ; রূপক, দীপক ও হীরক গঙ্গোপাধ্যায়—রাউতোড়া ; ঋতুপর্ণা, পম্পা ও প্রবীর—মালপাড়া ; বাম, বসন, বুকু ও অশোক—মশিয়াড়া ; ইন্দ্রনীল ও বাসুদেব মুখোপাধ্যায়—সোনামুখী ; সঞ্জয়, সমীর ও সুমনা সামন্ত—রেল কলোনী ; স্নেহাংশু সৌমিত্র, সন্দীপ, আলোছায়া প্রভৃতি—মটুকবনী ; শম্পা সঞ্জীব, পম্পা বাপ্পা প্রভৃতি—চকবাজার ; আশামুকুল ও বেলা রায়—বৈতল ; সুকুমার, সুনীল ও সলিল চক্রবর্তী—চাঁচর ; টুকু, চায়না, আরতি, কেনু ও সুবল—তিলুড়ী ; পুষ্প, কৃষ্ণা, পুতুল, চন্দনা, মিঠু ও বনু—তিলুড়ী ; মিনু, মেসোমশাই ও ইতিমাসী—রামসাগর ; বৈদ্যনাথ, সোমনাথ ও রুদ্রেন্দ্র রায়—বিষ্ণুপুর ; মোহন, হরিমোহন, অমর, রসময় প্রভৃতি—কেন্দুয়াডিহি।

মেদিনীপুর—অমিতাভ, অজিত ও নারায়ণ—হরিদাসপুর ; ইঙ্গিত, কাঞ্চন, শঙ্করী প্রভৃতি—খড়্গপুর ; তুলি ও মিঠু মিত্র—খড়্গপুর ; রাম, শ্যাম, কমল, দেবু, কুচু, প্রভৃতি—গোয়ালতোড় ; স্বপ্না, অঞ্জন, সঞ্জয়, বাবা ও মা—গড়বেতা ; গোপু, গজন, সোনু, রুমা, টিনা প্রভৃতি—মহিষাদল ; পুলিন, প্রণয় ও প্রাণেশ নায়েক—পানাছত্র ; মা, বাবা, আরতী, জয়ন্তী, তপতী, দেবাশীষ ও হাবুল—খড়্গপুর ; বিবেক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ—এগরা ; বুকাই, বাবুসোনা, মানস, মঞ্জু ও বেবী—দহিজুড়ি ; কার্তিকদা, অভিজিৎ, প্রসেনজিৎ, গজেন্দ্র, জয়তী প্রভৃতি—চন্দ্রকোণা রোড ; রাজা, সাথী, স্বপন, ক্ষমাবৌদি প্রভৃতি—মাতকাতপুর ; অশোক ও জয় কানুনগো—খড়্গপুর ; কাজল, টুবলু, পদ্ম, গোরা ও লাট্টু—বাছুরডোবা ; চঞ্চল, কৃষ্ণা, মা, বাবা, দাদা প্রভৃতি—গোয়ালতোড় ; টুটু, বিলু, কুমু, ঝুমু, মা ও বাবা—গোদাপিয়াশাল ; মুকুল, রবি, উমা, মঞ্জুশ্রী ও পিউ মিত্র—মেদিনীপুর ; অলোক, বাদী, খোকন ও সোনা দে—গড়বেতা ; কৃষ্ণা, শুক্লা, সোমা, মৌ, বাপ্পা ও কুচাই—

ক্ষীরপাই ; তপন, কাঞ্চন, শম্ভু, শংকর ও দেবকী—মথুরাকাটী ; অর্চনা, চন্দন ও রবি—সাউটিয়া।

বীরভূম—সেন্টু, বাসন্তী, চৈতালী ও শ্রাবণী—মুরারই ; চন্দনা চট্টরাজ—বোলপুর ; মহাবুব, নিতাই, শ্যামল, তাপস প্রভৃতি—মুরারই ; জয়ন্তী, বাদল ও রিংকি দত্ত—লোহাপুর ; বাবা, মা, গোরা, বুজদা ও টিংকু—মুরারই ; প্রবোধকুমার দত্ত—মুরারই ; চঞ্চল, চন্দন, তপন, অরুণ প্রভৃতি—বোলপুর ; প্রদীপ, কল্যাণ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি —তেঁতুলতলা রোড ; সুলেখা, রেখা, শিখা বিশ্বজিৎ ও বিমান দেবনাথ মুরারই ; কৃষ্ণা ও শিখা সরকার—সাঁইথিয়া ; অভিজিৎ, কাজরী, উর্মিলা, সঙ্গীতা প্রভৃতি—শান্তিনিকেতন ; মনি, অণু শিখিভূষণ প্রভৃতি—দুবরাজপুর ; নীলিমা, মাধুরী দেবাশিষ ও শুভাশিষ প্রধান রামপুরহাট ; কল্পনা চট্টরাজ—বোলপুর ; তপতী, অপর্ণা ও শিবু হালদার—রামপুরহাট ; শিখা, পথিক, কেকা, লিপিকা ও পার্থ-সারথী—সিউড়ী ; কাঞ্চন সিন্‌হা—আমোদপুর ; নিমাই ও মধুসূদন ঘোষ—কুণ্ডিরা ; শোভা, আলো ও উমা ভট্টাচার্য্য—শান্তিনিকেতন ; ভোম্বল, মুকুল, রুণু কল্যানী ও তুঙ্গশ্রী—বড়রা ; শিশির ও মলয়—বোলপুর ; অমিয়, প্রণতি, রীতা ও কাকলি প্রামাণিক—আমোদপুর ; বাপি, মনি টুটুল ও সচ্চিদানন্দ রায়—সিউড়ী।

পুরুলিয়া—মোহন, ধ্রুবল, সুবল, অনাথদা ও গীতা বৌদি—রঘুনাথপুর ; অনীতা, সুনীতা, কল্পনা, ফকিরদা ও হীরাবৌদি—রঘুনাথপুর ; সনাতন, ভুবন, কাজল, কাবেরী প্রভৃতি মোহুল-কোকা ; গায়ত্রী, সাবিত্রী, পদ্মাবতী, শান্তি প্রভৃতি - রঘুনাথপুর ; কুমুদ ও সুবল রায়—তালাজুলি ; সুবল মামা, তোতন, পুতুল, বুলু প্রভৃতি—মুনসেফডাঙ্গা ; বাবলু, মনু, চিনু, মামা, দিলীপ প্রভৃতি—রঘুনাথপুর ; অণু, মিতু, রবি, কাজল ও অভিজিৎ—সান্তালদি ; ত্রিদীপ, সন্দীপ, স্বপ্না, আলপনা প্রভৃতি—পুরুলিয়া ; শ্যামলকৃষ্ণ ব্যানার্জী—পুরুলিয়া ; মলিনা, গোপা, রিংকু ও সেজমামা—মান-বাজার ; মলিনা চৌধুরী—পুরুলিয়া ; ছবি, বুকাই ও চুমকি দত্ত—কোটশীলা, বজ্রীনারায়ণ, ঝুমা ও বিজুমাসী—গাদিবেড্যে ; বড়ন, ছোটন, দাদা, বৌদি, মা ও বাব—রঘুনাথপুর ; শঙ্কর, তুহিনা, রেশমী, বিমল ও অমিতাভ—পুরুলিয়া, শান্তনু ঘোষ ও দেবাশিষ দে—পুরুলিয়া ; অমল, জ্যোতি, দীপ্তি, সোমা ও চুনুদা—পুরুলিয়া ; শীতল-প্রসাদ বটব্যাল—অলাঙ্গডাঙ্গা ; পম্পা, সমু, রিন্টু, টুবলু, সুপু প্রভৃতি —সান্তালদি ; মা, বাবা, ভূতু, দোম, কৃষ্ণা ও পিনু—নদঁড়া ; মানা, পিকা, বাপী, বড় মামা ও তৃপ্তি ঘটক—অলঙ্গিডাঙ্গা ; মা বাবা, ঝিমলি, বিমলি ও শুভ্র ঘোষ—পুরুলিয়া ; অসিতকুমার গোস্বামী—গড়জয়পুর ; তপন, তারণ, সাধন, দুলাল প্রভৃতি—গড়জয়পুর ; স্বপন, বাবুয়া, টিটো প্রভৃতি—মানবাজার ; বুকুন, তুতুন ও ঠাকুরমা—সান্তালদি ; সমর, দেবাশীষ, নিন্তু, চম্পা—সান্তালদি ; বুড়া, বুড়ি, খুকু, গৌরী ও মহাদেব মাহাতো—হাতিরামগোড়া ; মালবিকা, সুমিতা, শঙ্কর ও পার্থপ্রতিম গুহ—আনাড়া ; শ্রীরাজ, স্বপন, বিজয়, কাশী ও লীলা—মধুপুর ; কিশোর, ত্রৈলোক্য, দীপক, সোমনাথ প্রভৃতি —মধুতটা ; বড়দা, অমিয় নীহেন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ হাজরা—ছড়রা ; তন্ময়, চিন্ময় ও সোনালী—মধুতটা ; গৌতম, জ্ঞানবিকাশ, অরবিন্দ ও আশীষ—মধুতটা।

মালদহ—দ্বীপায়ন, শুভায়ন, অনির্বাণ, অনিন্দ্য ও শম্পা—কালিতলা।

দার্জিলিং—রুমি, বাপ্পা, মুক্তি, রীতা ও প্রিয়বালা রায়—শিলিগুড়ি ; খোকন, অমল, অভিজিৎ প্রভৃতি—বিধান মার্কেট সুদীপ সেন—মাটিগাড়া ; সুজাতা ঠাকুর ও কৌশিক ভট্টাচার্য—শিলিগুড়ি ; শান্তি রঞ্জন রায় ও দুলাল সুর চৌধুরী—শিলিগুড়ি।

জলপাইগুড়ি—সুচরিতা, সুস্মিতা, অপরাজিতা, বিশ্বনাথ প্রভৃতি—মালবাজার ; স্বপন, তপন, রীণা পার্থ প্রভৃতি—বামনি ; পম্পা, শঙ্কর, সাধন, রাণা প্রভৃতি—লাটাগুড়ি।

বিহার—সাধন, নিখিল ও পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়—লয়াবাদ কলিয়ারী ; অনিমেষ, অনুপম, অঞ্জন, শ্যামলী প্রভৃতি—ধানবাদ ; ওঁঙ্কার, গোলক ও প্রদীপ—তার কোম্পানী ; সুখময়, জীমূহবাহন ও প্রণতি বক্সী —বাসদেওপুর কলিয়ারী—প্রবীর, প্রণব ও হেনা—পাটনা-১ ; মৌসুমী, স্বপন, মিলন, শ্যামল প্রভৃতি—চাষনালা ; শুক্লা, সুস্মিতা ও সাবি—কুসুণ্ডা ; দীনবন্ধু, স্বপ্না ও পুতুল—কুসুণ্ডা ; ত্রিদিব সেনগুপ্ত—চাইবাসা ; রমু, বুদো, পিকলু ও বাপ্পা—টিনপ্লেট ; ওঁঙ্কার, লক্ষ্মীদি, সিপ্রা, মৌ ও তারাদি—সি. এফ. আর. আই ; বুবুল, বাবুন, বাপি প্রভৃতি—সি. এফ. আর. আই ; দিলীপ, বিবেকানন্দ, কৃষ্ণা ও উমা—কুসুণ্ডা ; ঝুনু, টুনু, রাণু, সীমা প্রভৃতি—তারকোম্পানী ; সুময়, জয়, সোমালী ও কাকলী দে—পাটনা-১ ; দীপক, বাপী, মা, বাবা প্রভৃতি—জামসেদপুর ; অসীম, অরূপ, অশনি, রেশমী ও ডিম্পল—হিলকলোনী ; মা, বাবা, টুকাই, টুলটুলি প্রভৃতি—সাকচী ; বাবা, মা, বিশ্বজিৎ, লিপিকা ও শাশ্বতী—কাশরাসগড় ; মঞ্জু, অঞ্জু ও ইতি চট্টরাজ—জামসেদপুর-৩ ; মিলি, পলি ও মা—বিস্টুপুর ; প্রশান্ত, বিমল, বাবুসোনা ও রাঙ্গাবৌদি—লঙ্গরটোলা ; বুবান, বাবা, মা ও দিদা—রাঁচী ; বেবী, শীলা বিমল প্রভৃতি—পাটনা ; বিশ্বজিৎ, সন্দীপন, সুনীতা, সমীরণ ও অভিজিৎ—রাঁচী-৪ ; শিখা, বিচ্ছু, বুড়ি, মিতা ও বাবু—মহুদা ; প্রতাপ, রীনা ও প্রসেনজিৎ ঘোষ—জামসেদপুর-৪ ; মামণি, সুমিত, বাবলা ও গুড্ডু—বেকারো স্টিল সিটি ; রিন্টু, ঝুমু, শুভ্র, সৌম্য প্রভৃতি—জামসেদপুর-৪ ; অদিতি, অনুরাধা, সতীশ ও অসিত মুখার্জী—ঝরিয়া ; বিমল নায়েক ও রীতা রায়—হিরাপুর ; রূপেশ, তৃষা, শর্মিলা, মা ও বাবা—মুরি ; রঞ্জু, টুলু, রুমা, মমতা ও স্নিগ্ধা—অনিসাবাদ ; কৃষ্ণা সুশান্ত, শিব্রাম ও প্রশান্ত—পাকুড় ; বিশু, খোকন, মানিকদা, জগদীশ ও বাবুসোনা—ভিখনা পাহাড়ী ; বৃষ্টি ও রণো—রাঁচি ; চারু, বাবা, মা, প্রতিভা, পুতুল প্রভৃতি—চাণ্ডল ; অনিতা, সবিতা, মলয়, বাদল প্রভৃতি—কেন্দাডাংরী ; দিব্যেন্দুদা, দিদি, শুভ্র ও চন্দ্র—হাজারিবাগ ; বাবা, মা, কল্যাণী ও মল্লিকা রায়—হাজারীবাগ ; অসিত, রঙ্গিৎ, রীতা, মা, বাবা ও দিদা—কুমারডুবি ;

(বাকী উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় থাকবে।)

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত
এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য টা. ১·২৫

দার্জিলিঙে

সর্বাধুনিক আকর্ষণ

প্রানচঞ্চল ইউথ হোস্টেল

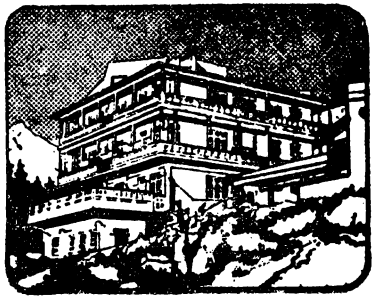

[illegible]

ট্যুরিস্ট ব্যুরো
৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ-বাগ (ইস্ট)
কলিকাতা ৭০০ ০০১, ফোন : ২৩-৮২৭১
গ্রাম : TRAVELTIPS

ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার
শিলিগুড়ি, ফোন : ২১১১৮

শারদীয়া নব কল্লোল ১৩৮৩

এ বছরের বিশেষ আয়োজন

৮টি সম্পূর্ণ উপন্যাস

তাছাড়া গল্প, ফিচার, সিনেমা, রঙ্গমঞ্চ, বোম্বের খবর এবং নানা ধরণের ছবি ও কার্টুনের বিচিত্র সমাবেশ।

এবার লিখেছেন

বিমল মিত্র (সুবৃহৎ উপন্যাস)	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
নিমাই ভট্টাচার্য	ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত
প্রফুল্ল রায়	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (সুবৃহৎ উপন্যাস)
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	আশাপূর্ণা দেবী
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়	প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী
মায়া বসু	ডাঃ বিশ্বনাথ রায়
তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী	সুরেশচন্দ্র সাহা
	শক্তিপদ রাজগুরু

এবং আরও অনেকে।

ছোট্ট বন্ধুদের জন্য বিশেষ সংবাদ—

যোগীন্দ্র নাথ সরকারের

হাসিরাশি

রং-বেরংয়ের ছবিতে
ছেপে বেরুলো

দাম: ৪ টাকা

"ছেলেরা সব খেলা ফেলে
বই নে বসে পড়ে;
মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়া
লোকের পিঠে চড়ে!"

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২-এ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

জামা কাপড়ের আয়ু তো আপনারই হাতে

শুধু বাড়ীতে কাচাই যথেষ্ট নয়
এর জন্য সবচেয়ে আগে দরকার
উচ্চমানের ডিটারজেণ্ট পাউডার

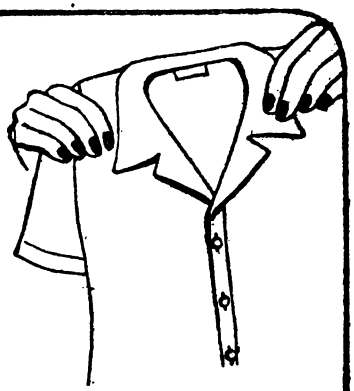

ডিটারজেণ্ট পাউডার যদি জলে গরম হয় তবে জানবেন তা আখেরে, জামাকাপড় অবশ্যই নষ্ট করবে। নতুন ফরমূলায় তৈরী সিফোম ডিটারজেণ্ট পাউডার জলে গরম হয় না। তাই সিফোম জামাকাপড় অনেক বেশী টেকসই করে। তাছাড়া ডিটারজেণ্টে ভরপুর নাম মাত্র সিফোম অল্প খরচে অল্প পরিশ্রমে অনেক বেশী জামাকাপড় অনেক বেশী পরিষ্কার ও ঝলমলে করে।

সিফোম

কাপড় বাঁচায় পয়সাও বাঁচায়

র‍্যাপসল ল্যাবরেটরী
১৪৬/৫ লেক গার্ডেনস্ ● কলিকাতা-৪৫

RL-10

ছোটোরা যখন ছোটো থাকে...

তখন তো তাদের দুরন্ত হওয়াই স্বাভাবিক। আর যারা স্বভাবতই শান্ত তারাও তো কখনো সখনো দুরন্তপনা করে। খেলতে গিয়ে অন্য সবায়ের মতো তারাও হাত-পা কেটে ফেলে। শরীরের নানা জায়গা তাদেরও ছড়ে যায়। ঘষা লাগে।

এইসব কাটা-ছেঁড়া-ফাটা-ঘষালাগা জায়গাগুলো দুষিত হ'য়ে উঠতে কী খুব সময় লাগবে। কারণ ধুলো-বালির নোংরা ধুলেও সহজে যায় না। তাই **বোরোলীন** হাতের কাছে রাখতে পরামর্শ দেওয়া।

বোরোলীন

ব্যবহারের অভ্যাস ছেলেবেলা থেকেই গ'ড়ে তোলা ভালো। দুরন্তপনার দিনগুলো থেকেই জানতে হবে, ছোটোবেলার দুষ্টুমির চিহ্নগুলো যাতে দুষিত না হ'য়ে ওঠে, যাতে ত্বক সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক ও মালিন্যমুক্ত থাকে তারজন্য সুরভিত

অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম **বোরোলীন**

ব্যবহার করাই নিরাপদ।

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

বোরোলীন হাউস, ১ সিরীশ চ্যাটার্জি, কলিকাতা-৭০০ ০০৩

মানচিত্রে ইতিহাস

বাংলা ভাষাতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত ছবি ও মানচিত্রের সাহায্যে ইতিহাস শিক্ষার অপূর্ব বই।

আদিম যুগের ভারতের মানচিত্র তারপর তার পরিবর্তন, আর্য যুগ, মহাভারত, অশোক থেকে বর্তমান পর্যন্ত ছবির সাহায্যে দেখান আছে।

এতে আছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্তম্ভ মন্দির ও পুরাকীর্তির সব প্রামাণ্য ছবি।

চার রঙের অফসেটে ছাপা ৮৮ পৃষ্ঠার বিরাট এই অসাধারণ বই মূল্য ৮ টাকা

আট টাকা পাঠালে রেজিষ্টারী করে বই পাঠান হবে।

দেব সাহিত্য কুটীর

২১নং ঝামাপুকুর লেন· কলিকাতা- ৯

এবার পূজায়.....

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

আগমনীর পাতায় পাতায় থাকবে ছোটদের মনের মত নানাজাতের গল্প। যেমন ভূতের গল্প, হাসির গল্প, রূপকথার গল্প, রোমাঞ্চকর গল্প, হাসির নাটিকা ইত্যাদি। আর থাকবে নানা ধরনের কবিতা, অসংখ্য একরঙা ও তিনরঙা ছবি, রঙিন্ চিত্র-কাহিনী, কার্টুন ইত্যাদি ছোটদের ভাললাগার মত সব কিছু উপকরণ। প্রতি বছরের মত এ বছরও বাংলার খ্যাতনামা লেখকদের লেখাতে আগমনী সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

দাম—দশ টাকা

এবার পূজায়

শিবরাম চক্রবর্তীর

হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্তীর অসংখ্য হাসির গল্পের দুষ্প্রাপ্য সংকলন। যেমন সব গল্প, তেমনি থাকবে মজার মজার ছবি। একরঙা ও তিনরঙা ছবিতে বইটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। বইটি পড়তে পড়তে সত্যিই হাসির চোটে দম ফাটবে।

ছেলেমেয়েদের হাতে দেবার একটি সুন্দর বই।

দাম—ছয় টাকা

এবার পূজায়.....

মধুসূদন মজুমদার সম্পাদিত

বহু লেখকের বহুরকম গল্পে ভরা এই সানাই। সানাই-এর মিষ্টি সুরের মূর্ছনার মত বইটির মিষ্টি গল্পগুলিও ছেলেমেয়েদের মন ভরিয়ে তুলবে। শুধু কি গল্প, যেমনি গল্প তেমনি একরঙা ও রঙিন্ ছবিতে বইটি ভরা। সুন্দর কাগজে ছাপা, সুন্দরভাবে বাঁধান। প্রথম নজরেই ছোটদের মন জয় করার মত বই। **দাম—ছয় টাকা**

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ ২১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯